উদ্যোক্তাদের জন্য স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স

(মেয়াদ - ১ দিন)

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

২০২০

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর অংগ

উদ্যোক্তাদের জন্য স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স

(মেয়াদঃ ১ দিন)

দিন	বিষয়							
	০৮.০০-০৮.৩০	০৮.৩০-০৯.৩০		৯.৪৫-১০.৪৫	১০.৪৫-১১.৪৫		১২.০০-১৩.০০	১৩.০০-১৪.০০
১	নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন	কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কোর্স পরিচিতি, এবং ভূমিকা (প্রয়োজনীয়তা ও মৎস্যখাদ্য পরিচিতি)	চা বি র তি	বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ ও তাদের পুষ্টিমান	খাদ্য তৈরির সূত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল ও প্রস্তুত প্রণালি ও খাদ্য প্রয়োগ হার, এবং খাদ্যের কার্যকারিতা, ও খাদ্য রুপান্তর হার (এফসিআর)	চা বি র তি	মৎস্য খাদ্য তৈরির মেশিন ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, ব্যবহার	স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্যখাদ্য তৈরি, মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ এবং মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা

উদ্যোক্তাদের জন্য স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স

(মেয়াদঃ ১ দিন)

কোর্সের বিষয়সূচি

দিন	ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
		প্রশিক্ষণ সময়সূচি	০২
১			
	১.১	নিবন্ধন, কোর্স উদ্বোধন	০৫
	১.২	কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কোর্স পরিচিতি এবং ভূমিকা (প্রয়োজনীয়তা ও মৎস্যখাদ্য পরিচিতি)	০৭
	১.৩	বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য, এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ ও তাদের পুষ্টিমান	১৯
	১.৪	খাদ্য তৈরির সূত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল ও প্রস্তুত প্রণালি, ও খাদ্য প্রয়োগ হার, এবং খাদ্যের কার্যকারিতা ও খাদ্য রুপান্তর হার (এফসিআর)	২৯
	১.৫	মৎস্য খাদ্য তৈরির মেশিন ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, ব্যবহার	৫১
	১.৬	স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্যখাদ্য তৈরি, মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ, এবং মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা	৫৬

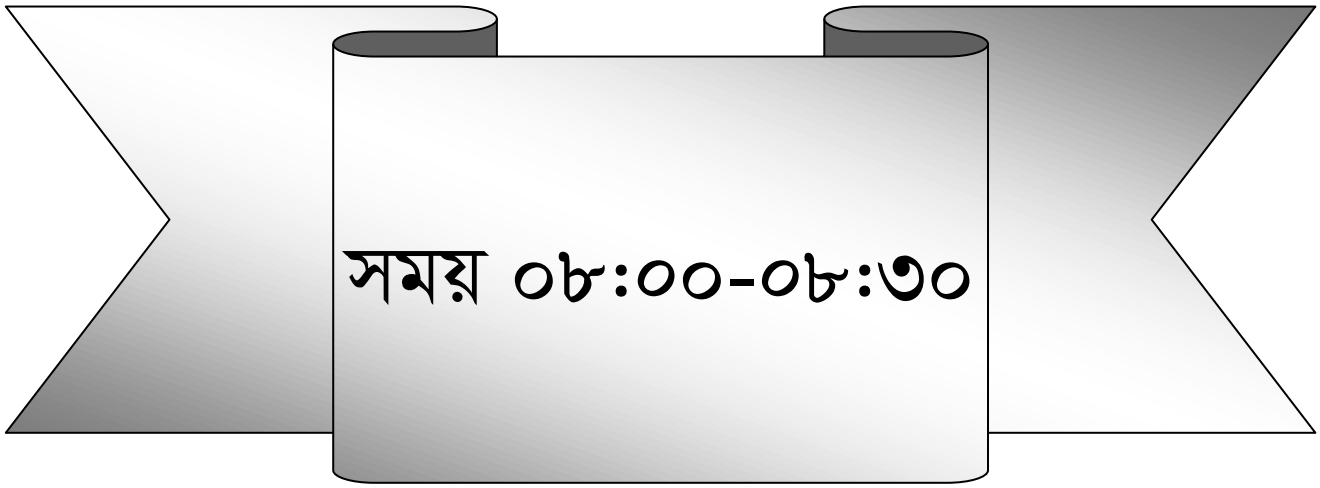

➢ নিবন্ধন, ও কোর্স উদ্বোধন

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়: ০৮:০০ - ০৮:৩০	**মেয়াদকাল:** ৩০ মিনিট

শিরোনাম: নিবন্ধন, ও কোর্স উদ্বোধন

অভীষ্ট দল: **উদ্যোক্তাগণ**

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন ও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

উদ্দেশ্য *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ফরমে নাম নিবন্ধন করবেন।
- প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটবে।
- আমন্ত্রিত অতিথিগণ কোর্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের মনে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হবে।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			২০মিনিট
	• প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ • সুনির্দিষ্ট ফর্মে প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন • প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য প্রদান • পরিচিতি পর্ব ও প্রধান অতিথি কর্তৃক কোর্স উদ্বোধন	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			৫মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো আলোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ভিপকার্ড, নেইমকার্ড/খাতা-কলম, ইত্যাদি।			

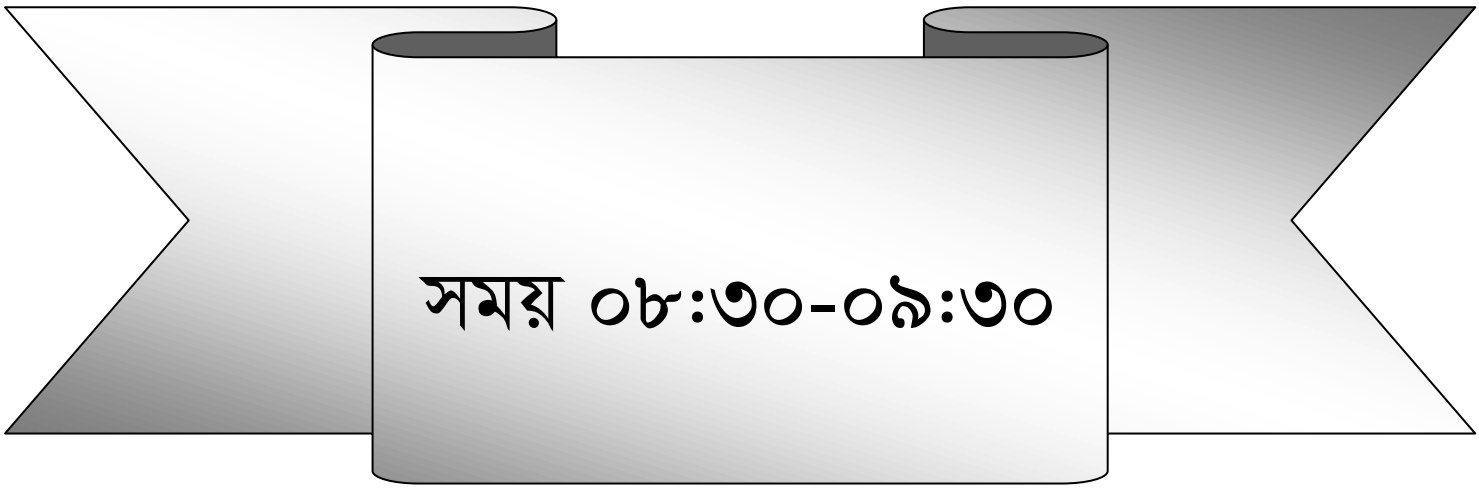

- কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কোর্স পরিচিতি, এবং ভূমিকা (প্রয়োজনীয়তা ও মৎস্যখাদ্য পরিচিতি)

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়: ০৮:৩০ - ০৯:৩০	**মেয়াদকাল:** ৬০ মিনিট

শিরোনাম: কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কোর্স পরিচিতি এবং ভূমিকা (প্রয়োজনীয়তা ও মৎস্যখাদ্য পরিচিতি)

অভীষ্ট দল: উদ্যোক্তাগণ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কোর্স পরিচিতি এবং ভূমিকা (প্রয়োজনীয়তা ও মৎস্যখাদ্য পরিচিতি) সম্পর্কে অবহিত করা হবে, যেন তারা পুরো কোর্স সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়ে উৎসাহিত রোধ করেন।

উদ্দেশ্যঃ *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মৎস্যখাদ্য বিষয়ে জানার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- মৎস্যখাদ্য বিষয়ে পরিচিত হবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০মিনিট
	• কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • কোর্স পরিচিতি • কোর্সের ভূমিকা (প্রয়োজনীয়তা ও মৎস্যখাদ্য পরিচিতি)	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			৫মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ভিপকার্ড, ল্যাপটপ, ইত্যাদি।			

উদ্যোক্তাদের জন্য স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মেয়াদ- ১ দিন

কোর্সের লক্ষ্য ঃ

এ প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের

মৎস্যখাদ্য সম্পর্কে পরিচিতি
বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য
স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ ও তাদের পুষ্টিমান
খাদ্য তৈরির সূত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল
খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি ও প্রয়োগ হার এবং এর কার্যকারিতা
খাদ্য রুপান্তর হার (এফসিআর)
মৎস্য খাদ্য তৈরির মেশিন ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, ব্যবহার
স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্য খাদ্য তৈরি, মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ
মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা

- এ সকল বিষয়ে **জ্ঞান** ও দক্ষতার উন্নয়ন করা হবে যেন উদ্যোক্তাগণ স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে মৎস্যখাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হন।

কোর্সের উদ্দেশ্য ঃ

এ প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

মৎস্যখাদ্য সম্পর্কে পরিচিতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন
বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন
স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ ও তাদের পুষ্টিমান সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন
খাদ্য তৈরির সূত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল সম্পর্কে জানতে ও লিখতে পারবেন
খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি ও প্রয়োগ হার এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে ও বর্ণনা করতে পারবেন
খাদ্য রুপান্তর হার (এফসিআর) সম্পর্কে জানতে ও লিখতে পারবেন
মৎস্য খাদ্য তৈরির মেশিন ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, ব্যবহার সম্পর্কে জানতে ও লিখতে পারবেন
স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্য খাদ্য তৈরি, মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন
মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন

কোর্স পরিচিতি

অঙ্কের খেলা

নিম্নের অংকগুলোর জন্য বিশেষ নির্দেশনা হলো যে, + চিহ্ন দ্বারা বিয়োগ, − চিহ্ন দ্বারা ভাগ, × চিহ্ন দ্বারা যোগ ও ÷ চিহ্ন দ্বারা গুণ বুঝানো হয়েছে।

সময়: ৬০ সেকেন্ড

১. ৫+ ৪ =

২. ৪- ২ =

৩. ৫×৩ =

৪. ৩÷৩=

৫. ৩ × ২ =

৬. ৩÷ ২ =

৭. ৪ + ২ =

৮. ৬ - ২ =

৯. ৫×৩=

১০. ৪ ÷ ৩ =

১১. ১ ÷ ২ =

১২. ২ ×৩ =

১৩. ৬ + ২ =

১৪. ৫ × ২ =

ভূমিকা প্রয়োজনীয়তা ও মৎস্যখাদ্য পরিচিতি

(প্রধানত প্রশিক্ষকের জন্য কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)

১. ভূমিকা

১.১ মৎস্যখাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

বিগত কয়েক দশকে দেশে চাষের অধীনে মাছের উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দেশ মাছ চাষে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি প্রায় ৬% এর কাছাকাছি। সরকারী-বেসরকারী সংস্থার নানামুখী উদ্যোগসহ ব্যক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগে মাছ চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। বর্তমানে মাছ চাষের আনুভূমিক সম্প্রসারণের পাশাপাশি উর্ধমুখী সম্প্রসারণ ঘটছে দ্রুত। মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামপর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্পসারণের জন্য ব্যাপক উদ্বেগ গ্রহণ করায় চাষের অধীনে মাছ উৎপাদনে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বে ৫ম অবস্থান ধরে রেখেছে। অধিক ঘনবসতির দেশ হওয়ায় দেশের বাজারে যেমন মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আছে তেমনি গ্রামীণ বেকার যুবকের আত্মকর্মসংস্থানের অন্যতম মাধ্যম পুকুরে মাছ চাষ। অনুকূল আবহাওয়া, মাছ চাষের সহজ প্রযুক্তি, উপকরণের প্রাচুর্যতা গ্রাম পর্যায়ে মাছ চাষের সম্প্রসারণ ঘটছে প্রতিনিয়ত। বর্তমানে বহুজাতিক কম্পানিসমূহ মৎস্য সংক্রান্তে কর্মকান্ডে বিনিয়োগ এগিয়ে আশাতে মৎস্য খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে এবং মাছ চাষে আধুনিকায়নের ছোঁয়া লাগছে। একক আয়তন জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। মাছে–ভাতে বাঙ্গালী আমাদের খাদ্য তালিকায় সবসময় মাছের অগ্রাধিকার থাকবেই। এ জন্য মাছের উৎপাদন আমাদের বাড়াতেই হবে। অপরদিকে ২০২১ সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মাছের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্র ৪৫ লক্ষ মে.টন ধরা হয়েছে, যা অর্জনের জন্য চাষের অধীনে মাছের উৎপাদন আবশ্যিকভাবে বাড়াতে হবে।

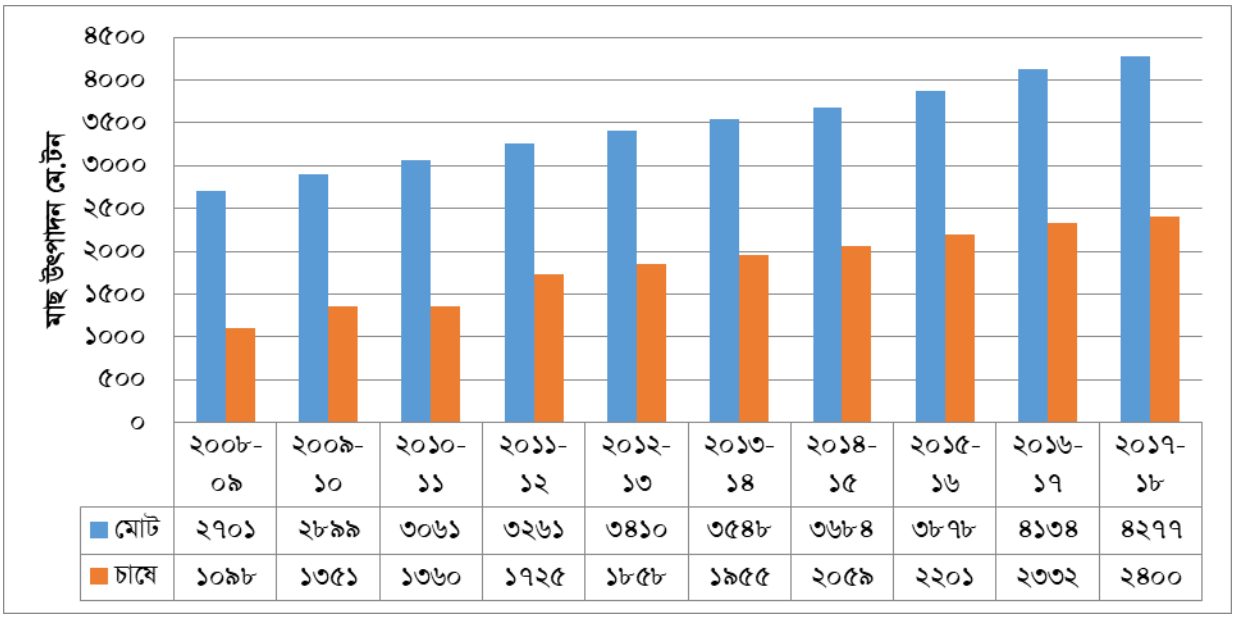

	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
মোট	২৭০১	২৮৯৯	৩০৬১	৩২৬১	৩৪১০	৩৫৪৮	৩৬৮৪	৩৮৭৮	৪১৩৪	৪২৭৭
চাষে	১০৯৮	১৩৫১	১৩৬০	১৭২৫	১৮৫৮	১৯৫৫	২০৫৯	২২০১	২৩৩২	২৪০০

উন্নত মৎস্য খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি এবং মাছ চাষের নিবিড়তাসহ মাছ চাষের ব্যাপক সম্পসারণ ঘটায় বাজারে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, মাছের বাজার দর বিগত ১০ বছরে অনেক ক্ষেত্রে কমে গেছে। কিন্তু কারখানা নির্ভর বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্যের উৎপাদন খরচ সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। অন্যদিকে পুকুরের ভাড়া, শ্রমিক মজুরীসহ মাছ চাষের অন্যান্য উপকরণের দাম বৃদ্ধি মৎস্য চাষের সার্বিক উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে চাষি আগের মত আর মাছ চাষে লাভবান হতে পারছেন না। মাছের বাজার দর এবং চাষির উৎপাদন খরচে সমন্বয় না থাকাতে চাষি অধিক ফলনশীল সম্পূরক খাদ্যের উপর নির্ভরশীল প্রজাতির মাছ যেমন পাংগাস, তেলাপিয়া, কৈ মাছের চাষ কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অনেকেই বাৎসরিক মাছ উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকাও ব্যাক্ত করতে শুরু করেছেন। এতে চাষি পর্যায়েও হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে।

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখা, চাষিকে মাছ চাষে সম্পৃক্ত রাখা এবং মাছ চাষকে লাভজনক ব্যবসা হিসাবে টিকিয়ে রাখার জন্য এর উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। এজন্য মাছের গুণগত মানের পোনা নিশ্চিত করা, চাষ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনার

পাশাপাশি মৎস্য খাদ্য মূল্য কমানোর কোন বিকল্প নাই। মাছ চাষে মোট বিনিয়োগের ৬০-৭০ ভাগ খরচ হয় মাছের খাদ্য ক্রয়ে। আর সে জন্য মৎস্য খাদ্য উৎপাদন খরচ কমানোর এবং খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রাখার স্বার্থে স্থানীয় সহজ প্রাপ্য উপকরণ সহযোগে ছোট আকারের পিলেট ম্যাশিনের সাহায্যে চাষির নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করতে হবে। আর এ কাজ সফলভাবে পারার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবলের পাশাপশি লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে স্থানীয় উপকরণের সাহায্যে মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবার জন্য এ মডিউল ভূমিকা রাখবে।

মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের বিদ্যমান অবস্থা

বাণিজ্যিক মাছ চাষের সম্প্রসারণ বৃদ্ধির অর্থই প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভশীলতা কমিয়ে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করা। মাছচাষের আধুনিকায়ন এবং উন্নত প্রযুক্তিতে মাছচাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণে বাংলাদেশে দ্রুত বেড়ে চলেছে মৎস্য খাদ্যের চাহিদা। বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্যের উৎপাদন ২০০৮ সালে ছিল মাত্র ৪ লক্ষ মে. টন। চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০১২ সালে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে ১০ লক্ষ মে.টনে উন্নিত হয় এবং এ সময় স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ ছিল ৩-৪ লক্ষ মে.টন। বাণিজ্যিক পিলেট মৎস্য খাদ্য গ্রাম পর্যায়ে এখনো ভালভাবে পৌছে নাই। স্থানীয় পর্যায়ে ছোট আকারের পিলেট মেশিন দ্বারা ভিজা অর্ধ ভিজা খাদ্যের উপরই তাঁরা নির্ভরশীল। বিগত ৪-৫ বছরে মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের উন্নয়ন ঘটেছে আরো ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে নতুন নতুন আধুনিক ভাসমান খাদ্য তৈরির কয়েকটি বড় কারখানা স্থাপিত হয়েছে যারা বাজারর চাহিদা অনুসারে খুবই ছোট দানার (০.৫ -২.০ মিমি) খাদ্য তৈরি করছেন যা কিছু দিন আগেও বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। দেশে ২০০৮ সালে বাণিজ্যিক ভাবে খাদ্য উৎপাদনের ছোট বড় ৬০ কারখানা থাকলেও বর্তমানে তা বেড়ে ১০০টিতে উন্নিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে স্থাপিত খাদ্য মিলের উৎপাদন ক্ষমতা যেমন বেশি তেমনি খাদ্যের গুণগত মানও খুবই উন্নত। এসকল কারখানায় খুবই উন্নত মানের মাছের বয়স ভিত্তিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে নানা পুষ্টিমানের ও বিভিন্ন আকারের দানাদার খাদ্য তৈরী হচ্ছে যার এফসিআর মান খুবিই আশাবাঞ্জক। দ্রুত প্রসারমান বাণিজ্যিক প্রযুক্তিভিত্তিক মাছ চাষের ব্যাপক সম্পসারণের কারণে বাৎসরিক মৎস্য খাদ্য চাহিদার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্টরা মনেকরছেন দেশে বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্যের বর্তমান উৎপাদন প্রায় ৩০ লক্ষ মে.টন, যার ৪০% ভাসমান, ৪০% ডুবন্ত এবং ২০% স্থানীয় পর্যায়ের ডুবন্ত পিলেট স্থানীয়ভাবে ভিজা খাবার তৈরি হয় আরো প্রায় কয়েক লক্ষ টন। বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের কেবল পরিমাণগত নয়, মানগতভাবেও উন্নতি হয়েছে দৃষ্টান্তমূলকভাবে। স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্য ও কারখানাই উৎপাদিত ডুবন্ত পিলেট খাদ্য ক্রমান্বয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে উন্নতমানের ভাসমান দানাদার খাদ্যের মাধ্যেমে যার উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।

শতাধিক খাদ্য মিলের মধ্যে ১২-১৫ বড় আকারের মিল মোট বাণিজ্যিক খাদ্যের প্রায় ৬০-৭০% উৎপাদন করে থাকে। বিশেষ করে গত ২-৩ বছরে খাদ্য উৎপাদরকারী মিলের আনুভূমিক সম্প্রসারণের চেয়ে উলম্বিক সম্প্রসারণ অধিক ঘটেছে। এ সময়ে অন্ত ২০ কোম্পানি তাদের উৎপাদন ক্ষমতা আগের বছরের থেকে ঘন্টায় ৫-১০ টন খাদ্য উৎপাদ ক্ষমতা বাড়িয়েছে। এ সময়ে কমপক্ষে ১৩টি কম্পানি তাদের মিলে ভাসমান খাদ্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্রাংশ সংযোগ করেছেন। স্থাণীয় ভাবে তৈরি ছোট ছোট পিলেট মিলের সংখ্যা কতটি তা ধারণা করা কঠিন তবে এর সংখ্যা ১০০০টির ও বেশি হতে পারে। স্থানীয়ভাবে এ মিলগুলো তৈরি করতে ১-২ লক্ষ টাকা পড়ে থাকে এবং এ মিলের সাহায্যে খামারে পিলেট খাবার তৈরি হয়। এসব মিলে প্রতি ঘন্টায় ৫০-৩০০ কেজি পিলেট খাদ্য উৎপাদন করা যায়। তবে খাদ্য উৎপাদনের সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা অভিজ্ঞ কর্মী না থাকাতে অনেক ক্ষেত্রে ভাল মানের খাদ্য তৈরি হচ্ছে না। ডুবন্ত খাবার খেতে ভাসমান খাদ্যের উৎপাদন খরচ তুলনামূলক বেশি। বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ মৎস্যখাদ্য উৎপাদন খাতে যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে খাদ্য মিলগুলো কেবল উন্নতমানের খাদ্যই তৈরি করছে না তাদের উৎপাদিত খাদ্য বাজারজাতহকরণে দেশব্যাপী ডিলার, মার্কেটিং ও কারিগরী জনবল নিয়োগ করেছেন। তাঁরা খাদ্য বিক্রয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পাশাপাশি মাছ চাষি যাতে তাদের খাদ্য মাছ চাষে ব্যাবহার করে ভাল ফলাফল পান সে জন্য কারিগরি পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি মাছ চাষের খামার তদারকির ব্যবস্থা করছেন। এসকল নানাবিধ কারণে উৎপাদিত বাণিজ্যিক খাদ্যের দাম প্রতনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ডিলারদের বাকিতে খাদ্য বিক্রয়, মিল মালিকের বাজার সম্প্রসারণ কর্মীদের তৎপরতায় চাষি ঝুকে পড়ছেন আধুনিক পিলেট খাবারের দিকে। মৎস্য খাদ্য যেহেতু চাষিই ব্যবহার করেন সেজন্য চাষিকেই পরিশোধ করতে হচ্ছে সর্বমোট মূল্য।

মাছ চাষি মাছের খাদ্য মূল্য হিসাবে যে ১০০ টাকা পরিশোধ করছে তা = কাঁচামালের মূল্য (৭৩%)+খাদ্য তৈরিতে খরচ (১৫%)+খাদ্য কারখানার মালিকের লাভ (৬%)+খাদ্য ব্যবসায়ির/ডিলারের লাভ (৬%)।

উন্নত ম্যাশিনারিজ ও প্রশিক্ষিত দক্ষজনবল এবং স্থানীয় ও আমদানিকৃত উন্নতমানের কাঁচামাল ব্যবহারে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের গুণগত মান উন্নত হলেও উৎপাদিত খাদ্য মূল্য মাছের বাজার দরের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই সংগতিপূর্ণ নয়। বর্তমান সময়ে চাষির তথা মাছ চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করছেন মাছের খাদ্য দাম না কমাতে পারলে এ খাতের অগ্রগতি ধরে রাখা যাবে না।
দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক অভিজ্ঞ চাষি তাঁর প্রয়োজণীয় খাবার নিজেই তৈরি করে মাছ চাষ করছেন বেশ লাভজনকভাবে। বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনায় রেখে প্রান্তিক চাষিদের মাছ চাষে উৎসাহিত করা এবং মাছ চাষকে লাভজনক পর্যায়ে রাখার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত মৎস্য খাদ্য উপকরণ দিয়ে ছোট আকারের পিলেট মেশিনে খামারি তাঁর নিজস্ব জনবল দ্বারা খাবার তৈরি করতে হবে। এর ফলে চাষি নিজস্ব উৎপাদিত খাদ্যের উপকরণ এবং পুষ্টিমান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন এবং উৎপাদিত খাদ্যের মূল্যও পড়বে অনেকাংশে কম। মাছ চাষের মুখ্য খরচ হয় মাছের খাদ্য ক্রয়ে সেজন্য এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে মাছের খাদ্য মূল্য গ্রহণযোগ্য রাখার এবং খাদ্যের সর্বোচ্চ কার্যকরী ব্যবহারের জন্য।

১.২ মৎস্যখাদ্যের পরিচিতি

(১) মৎস্য খাদ্যের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় গুরুত্ব পূর্ণ সংজ্ঞা

(১.১) মৎস্যখাদ্য উপকরণ

এমনসব পুষ্টিকর উপাদান বুঝাইবে যা মৎস্য ও চিংড়িখাদ্য তৈরি করার জন্য এককভাবে বা মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হয়। তবে, ক্ষেত্র বিশেষে এককভাবে এসব খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান নাও থাকতে পারে। উপাদানসমূহ উদ্ভিদ, প্রাণীজ, জৈব এবং অজৈব উৎসের হতে পারে।

(১.২) মৎস্যখাদ্য

মৎস্যখাদ্য বলতে মাছ ও চিংড়ির জীবন ধারণ, বৃদ্ধিসাধন ও অপুষ্টি হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে কারখানায় বা অন্য কোনভাবে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পুষ্টিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বা উপকরণের মিশ্রণে তৈরি খাদ্য বুঝায়। অর্থাৎ যে খাদ্য খেয়ে মাছ ও চিংড়ি তাদের জীবনধারণ, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং বংশ বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি, তাপ ও শক্তি অর্জন করে তাই মৎস্যখাদ্য।

(১.৩) সুষম খাদ্য

যে সকল খাদ্য মাছের জীবনধারণ, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, প্রজনন এবং বংশ বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান যথা- আমিষ, শর্করা, স্নেহ বা তৈল, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ মাছের পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান থাকে সে সকল খাদ্যই সুষম খাদ্য।

(১.৪) সম্পূরক খাদ্য

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি বাহির থেকে যে তৈরি খাদ্য বা খাদ্য উপাদান সরবরাহ করা হয় সেটাই সম্পূরক খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য একক কোন উপাদান কিংবা বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে মিশ্রিত খাদ্যও হতে পারে।

(১.৫) খাদ্য সংযোজক

'ফিড এডিটিভ' বলতে খাদ্যে মিশ্রিত এমন সব উপাদানকে বুঝায় যাতে পুষ্টিমান থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। ইহা খাবারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রভাব ফেলে এবং খাদ্যের প্রতি মাছের আকর্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

(১.৬) ফিড বাইন্ডার

'ফিড বাইন্ডার' হলো- খাদ্যে ব্যবহৃত এমন উপাদান বা খাদ্য উপকরণসমূহকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংযুক্ত রাখে। এতে পানিতে খাদ্যের স্থায়ীত্বকাল বৃদ্ধি পায়। ফলে, মাছ সহজে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

(১.৭) পুষ্টি বিরোধী উপাদান

'পুষ্টি বিরোধী উপাদান' বলতে- মৎস্যখাদ্যে সে সমস্ত উপাদান যা বিদ্যমান থাকলে বা সংযুক্ত বা সংক্রমিত হলে মাছেও বিপাকীয় কার্যাবলি বৃদ্ধি পায় ফলে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(১.৮) আদর্শ মাত্রা

মৎস্যের পুষ্টি সাধন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মৎস্যখাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান, যথা- আমিষ, স্নেহ, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ, আর্দ্রতা, ভস্ম, আঁশ ইত্যাদির নির্ধারিত ব্যবহার মাত্রা।

(১.৯) ঔষধ মিশ্রিত খাদ্য

কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কোন প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক হিসেবে খাদ্যে কোন ঔষধ জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করা হলে তাকে ঔষধমিশ্রিত খাদ্য বলে।

(১.১০) অবাঞ্চিত দ্রব্য

মৎস্য ও চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বা উপকারী নয় এমনসব উপাদানকে বুঝায়। এসব দ্রব্যাদি মাছ/চিংড়ির জন্যও স্বাস্থ্যপ্রদ নয় এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত মাছ/চিংড়ি উৎপাদনে সহায়ক নয়। এসকল দ্রব্যাদি খাদ্যে মিশালে ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর হয়।

(১.১১) অশোধিত আমিষ

খাদ্যের মধ্যস্থিত নন-প্রোটিন নাইট্রোজেনসহ আমিষকে অশোধিত আমিষ বা Crude protein বলে। খাদ্যের মধ্যে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনকে ৬.২৫ দ্বারা গুণ করলে অশোধিত আমিষ বা ক্রুড প্রোটিনের পরিমাণ জানা যায়। খাদ্যে নাইট্রোজেন এর পরিমাণ থেকে আমিষের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

(১.১২) অশোধিত আঁশ

খাবারের মধ্যে সেলুলোজ, হেমি-সেলুলোজ এবং লিগলিন জাতীয় বস্তুকে অশোধিত আঁশ বলে।

(১.১৩) এমাইনো এসিড

জৈব এসিড যা ক্ষারীয় এমাইনো এবং অম্লীয় কার্বক্সিল গ্রুপ সমন্বয়ে গঠিত। এমাইনো এসিড হলো- আমিষ বা প্রোটিন এর কার্যকরী উপাদান।

(১.১৪) অত্যাবশ্যক এমাইনো এসিড

যে সমস্ত এমাইনো এসিড প্রাণী তার নিজ দেহের মধ্যে তৈরি করতে পারে না এবং যা খাবারের মাধ্যমে সরবরাহ করা ছাড়া অন্যকোন বিকল্প নেই সেসব এমাইনো এসিডকে অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বলা হয়। মাছের জন্য মোট ১০টি এমাইনো এসিড অত্যাবশ্যক যেগুলো হলো- আরজিনিন, হিষ্টিডিন, লাইসিন, লিওসিন, আইসোলিওসিন, মিথিওনিন, থ্রিওনিন, ফেনাইল এলানিন, ভেলিন ও ট্রিপটোফেন।

(১.১৫) নন-প্রোটিন নাইট্রোজেন

প্রোটিনের অংশ ছাড়া অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা হবে নন-প্রোটিন নাইট্রোজেন। যেমনঃ অ্যামোনিয়া, ইউরিয়াতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন।

(১.১৬) নাইট্রোজেন মুক্ত এক্সট্রাক্ট বা কার্বোহাইড্রেট/শর্করা

খাদ্যের আর্দ্রতামুক্ত অংশ বা ড্রাই ম্যাটার ক্রুড প্রোটিন, ক্রুড লিপিড, ক্রুড ফাইবার ও আঁশ এর পরিমাণের সম্মিলিত যোগফলকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই নাইট্রোজেন মুক্ত এক্সট্রাক্ট বা নির্যাস বা কার্বোহাইড্রেট/শর্করা।

(১.১৭) খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন

খাদ্যের নির্যাস বা জৈব অংশ যা খাদ্যে খুব কম পরিমাণে থাকে কিন্তু মাছের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়। যেমন- ভিটামিন এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। প্রাকৃতিক উৎস যেমন- বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য হতে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কোম্পানী সিনথেটিক ভিটামিন উৎপাদন ও বিপণন করে।

(১.১৮) খনিজ লবণ

খাদ্যের অজৈব পদার্থ যথা- সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদিকে খনিজ লবণ বলা হয়। মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইহা সামান্য পরিমাণে দরকার হয়।

(১.১৯) ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স

মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী সকল ভিটামিন ও খনিজ লবণ একসাথে মিশিয়ে যে মিশ্রণ তৈরি করা হয় তাহাই ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ। মাছের খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় খুবই অল্প পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ ব্যবহার হয়। খাদ্যে ভিটামিন ও মিনারেল না থাকলে মাছ বাড়ে না ও মাছে রোগ হয়।

(১.২০) পিলেট খাদ্য (Pelleted feed)

খাদ্য উপকরণ পিলেট মেশিনে দিয়ে উচ্চ চাপে ও তাপে ছিদ্রযুক্ত ডাইস বা চালনির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে চাপা (কমপ্যাক্ট), ফাপা (এক্সট্রুডেড) পার্টিকল সাইজের শুকনা যে দানাদার খাদ্য তৈরি করা হয় তাকে পিলেট খাদ্য বলা হয়। গ্রোয়ার এবং ফিনিশার খাদ্য সাধারণত পিলেট আকারে তৈরি হয়।

(১.২১) প্রোটিন কনসেনট্রেট (Protein concentrate)

উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রাণীজ ও উদ্ভিজ খাদ্য উপকরণের অংশ বা টুকরা বা খন্ডকে প্রক্রিয়াজাত করে প্রোটিন কনসেনট্রেট তৈরি করা হয়। বিভিন্ন বাণিজ্যিক কোম্পানী ইতা ফরমুলেশন, তৈরি ও বাজারজাত করে।

(১.২২) রঞ্জক (Pigments)

তিনশরও বেশি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট উদ্ভজ্ব ও প্রাণিজ রঞ্জক (ক্যারোটিনয়েড) শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। খাদ্য গলাধঃকরণ ত্বরান্বিত করা (খাদ্য কণাকে অধিকতর দৃশ্যমান করা বা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা), চামড়া বা মাংস রঞ্জিত করার জন্য খাদ্যে এই খরণের উপাদান যুক্ত করা যায়। ক্যারোটিনয়েড মাছ (বিশেষতঃ Salmonids এর ক্ষেত্রে) ও চিংড়ির মাংস, চামড়া এবং ডিমের ক্ষেত্রে হলুদ, কমলা এবং লাল রং ধারণ করতে সাহায্য করে।

(১.২৩) পিলেট বাইন্ডার (Pellet binders)

খাদ্যোপাদানের সহিত বন্ধনকারী দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। ইহা বড় আকারের পিলেট তৈরিতে সাহায্য করে এবং নাড়াচাড়া, সংরক্ষণ ও পানির সংস্পর্শে সহজে গলে যায় না। ফলে পানিতে খাদ্যের স্থিতিশীলতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ভিটামিন ও মিনারেলসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের অপচয় রোধ হয়।

(১.২৪) হরমোন (Hormone)

বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক ও সংশ্লেষী হরমোন, যেমন- বর্ধক হরমোন, থাইরয়েড হরমোন, ইনসুলিন এবং বিভিন্ন যৌন স্টেরয়েড, মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষণে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সংশ্লেষী এন্ড্রোজেন সমৃদ্ধ খাবার কোন কোন প্রজাতির (বিশেষতঃ Salmonid) মাছের বৃদ্ধিতে ত্বরান্বিত করে খাদ্য রূপান্তর হার উন্নত করে। আবার কিছু কিছু উষ্ণ পানির প্রজাতিকে (যেমন- Chanel catfish) এন্ড্রোজেন সমৃদ্ধ খাবারে বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী স্টেরয়েড জাতীয় খাবার ব্যবহারে অথবা বেশি পরিমাণ স্টেরয়েড সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে মারাত্নক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, যেমন- জননাঙ্গ (Gonad) বৃদ্ধিতে Hypotrophy, হাড়ের

বিকলাঙ্গতা, ঘা সৃষ্টি এবং লিভার, কিডনী ও পোষ্টিক নালীতে রোগ সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়ন করে। আহারযোগ্য মাছের বৃদ্ধিতে এসব হরমোন ব্যবহারের জন্য FDA এবং EU এর অনুমোদন নেই।

(১.২৫) অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic)

অ্যান্টিবায়োটিক এক প্রকার জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ। এদের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিরৎসাহিত করা হয় কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ (Residue) মাছ ও চিংড়ির দেহ থেকে যেতে পাওে যা পরিণামে মানুষের স্বাস্থ্যেও জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তবে, যদি রোগ নিয়ন্ত্রণে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তবে শুধুমাত্র অনুমোদিত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার, অনুমোদিত মাত্রা এবং মেয়াদকাল অবশ্যই মানতে হবে।

(১.২৬) অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (Antioxidant)

খাদ্যে স্নেহ বা চর্বি জাতীয় পদার্থের অক্সিডেশনের ফলে কোন কোন অত্যাবশ্যকীয় স্নেহ এবং ভিটামিনের পুষ্টিমান কমে যেতে পারে। খাদ্যে বিশেষ করে ভিটামিন-ই বা সেলিনিয়াম অনুপস্থিত বা সামান্য পরিমাণ উপস্থিত থাকলে প্রো-অক্সিডেটিভ যৌগ তৈরি হতে পারে যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। অক্সিডেশন সংবেদনশীল পুষ্টি সংরক্ষণ এবং বিষাক্ত পার-অক্সাইড যৌগ উৎপাদন বাধাগ্রস্ত করার জন্য মাছের খাদ্যে সংশ্লেষিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ব্যবহার করা উচিত। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যৌগসমূহ যেমন- Ascorbic acid, Alphatocopherol মাছের খাদ্যে দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হয় না এবং ইহারা ভাল সংরক্ষকও নহে। বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত এসকরবিক এসিডের উৎস, যেমন- 1-Ascorbyl-2-Phosphate এবং Alphatocopherol এর উৎস যেমন- Alphatocopherol acid এর সামান্য অ্যান্টিঅক্সিডেটিভ কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়।

(১.২৭) মাইকোটক্সিন (Mycotoxin)

তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা অনুকূলে থাকলে অনেক ধরণের খাদ্য উপাদান ও প্রস্তুতকৃত খাদ্যে ছত্রাক জন্মায়। কিছু কিছু ছত্রাক বিষ উৎপাদন করে যা কারসিনোজেনিক, সাইকোটক্সিক অথবা নিউরোটক্সিক। খাদ্য ও খাদ্য উপাদান পঁচায় এ ধরনের বেশি পরিচিতি ছত্রাক হচ্ছে *Aspergillus sp.* এবং *Penicillium sp.* উপরোক্ত ছত্রাক জন্মানোর অনুকূল তাপমাত্রা ২৫-৩০° সে এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫% এর নীচে। খাদ্য ও খাদ্য উপাদানে ১৫% বেশি আর্দ্রতা থাকলে ছত্রাক জন্মানোর প্রবণতা থাকে। সুতরাং, খাদ্য উপাদান প্রক্রিয়াকরণ এবং পিলেটের যথাযথ শুষ্ককরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছত্রাক স্পোর প্রতিরোধক্ষম এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সুপ্ত থাকে। সংরক্ষণের অবস্থা ভাল না হলে ছত্রাক জন্মানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। প্যাকেটকৃত খাদ্য এবং খাদ্য উপাদানের মধ্যে যদি আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বেশি থাকে তাহলে ছত্রাক জম্মানোর পরিবেশ আরো অনুকূল হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছত্রাকজনিত মাইকোটক্সিন মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

(১.২৮) মৎস্যখাদ্য ও ফিস ফিলেট এর রং (Pigmentation and diet)

মাছ ও ফিস ফিলেট এর রং এবং এর গঠন (texture) অনেকাংশে নির্ভর করে কী ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে মাছটি বেড়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বে মাছ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মাছ রপ্তানির জন্য উৎপাদিত মাছের রং ও বর্ণ চাষিদের মাঝে খুব গুরুত্ব বহন করে। তাই মৎস্যখাদ্য তৈরিকারক তথা মৎস্য পুষ্টিবিদকে খাদ্যের কাঁচামাল ও উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ চর্বিতে দ্রবণীয় ক্যারোটিনয়ড জাতীয় উপাদান মৎস্যখাদ্যে যোগ করতে পারলে ফিস ফিলেট এর বর্ণ উজ্জ্বল হবে।

(২) সম্পূরক খাদ্য কী?

(২.১) সম্পূরক খাবারের বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

ক) মাছ দ্রুত বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য পানিতে জন্মানো প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাহির থেকে যে সব বাড়তি খাবার (উপকরণ) মাছকে সরবরাহ করা হয় তাদেরকে সম্পূরক খাবার বলে। মাছের সুষম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ৪০টির মত অপরিহার্য খাদ্যপুষ্টির (Essential dietary nutrients) সরবরাহ। যা সম্পূরক খাবার থেকে পাওয়া যায়।

খ) পুকুরের প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি মাছের বর্ধনের জন্য যে খাদ্য দ্রব্যই বাহির থেকে সরবরাহ করা হয় তাহাই সম্পূরক খাবার। সম্পূরক খাবার একটি মাত্র উপকরণে হতে পারে আবার বিভিন্ন প্রকার উপকরণ বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করেও তৈরি হতে পারে।

গ) মাছের খাবার ঐসকল দ্রব্য যা পুষ্টি ধারণ করে ও শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করে এবং যা মাছ গ্রহণে

- ❖ মাছের ওজন বৃদ্ধি পায়
- ❖ স্বাস্থ্য সুরক্ষা হয়
- ❖ শরীরে তাপের যোগান দেয়
- ❖ মাছের বর্ধন সহায়তা করে
- ❖ রোগ প্রতিরোধ করে এবং
- ❖ প্রজনন সক্ষমতা অর্জন করে

(২.২) মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

দৈহিক বৃদ্ধি ও বেচে থাকার জন্য মাছ পুকুরের পরিবেশ থেকে প্রাণিকণা, উদ্ভিজ্জ, তলদেশে পোকা-মাকড়, শুককীট, ছোট ছোট কীটের লার্ভা, তলার কেঁচো, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গস্থহণ করে। তা ছাড়া কয়েক প্রজাতির মাছের (যেমন পাবদা, শিং, মাগুর, কৈ, শৈল ইত্যাদি) স্বজাতিভোজীতারোধেও সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয়। পুকুরের পরিবেশ যখন প্রাকৃতিক খাবারে প্রচুর্যতা থাকে প্রাচুর্যতা থাকে সেখানে সম্পূরক খাবার সুষম না হলেও চলে। কিন্তু যেখানে উচ্চ ঘনত্বে মাছ চাষ করা হয়, যেখানে প্রাকৃতিক খাদ্যের কোন ভূমিকা থাকে না বা খুবই কম ভূমিকা থাকে, যখর ঘরের মধ্যে হাউজে মাছ চাষ করা হয়, যখন খাঁচায় বদ্ধ পরিবেশে মাছ চাষ করা হয় তখন পুষ্টিগতভাবে সুষম সম্পূরক খাবার আবশ্যিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। মাছের উৎপাদনশীলতা (Productivity) বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুষ্টি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। মাছ চাষে সম্পূরখ খাবারের ব্যবহারের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উল্লেখিত হলো ঃ

- মাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করা
- মাছের বাচার হার বৃদ্ধি করা
- অল্প সময়ে মাছ বিক্রয় উপযোগী করা
- মাছের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- মাছের (কিছু প্রজাতির) স্বজাতি ভোজীতা রোধ করা
- মাছের অধিক উৎপাদন তথা মাছ চাষের লাভ নিশ্চিত করা
- উৎপাদিত মাছের গুণগত মানের উন্নয়ন করা
- মাছে প্রজনন সক্ষমতা বজায় রাখা

বর্তমানে আমাদের দেশের পুকুর-দিঘী ও মৎস্য ঘেরে গড় হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৪.৭৬ মে.টন। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে এ সমস্থ জলাশয়ে আধাঁ- নিবিড় পদ্ধতিতে সম্পূরক খাবার ব্যবহারে চাষ করে উৎপাদনের পরিমাণ সহজেই বাড়ানো সম্ভব। মাছের মজুদ ঘনত্ব কম থাকলে মাছ প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে বড় হতে পারে। মাছ চাষের ধরনকে প্রাথমিকভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা ব্যাপক, আধা-নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতি। এ সকল পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের পোনা মজুদ, প্রাকৃতিক খাদ্য এবং সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের একটি সম্পর্ক আছে। মজুদ ঘনত্ব যতই বাড়তে থাকবে কৃত্রিম/সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ততই বাড়তে থাকবে। নিচে মাছের ব্যাপক, আধা-নিবিড় ও নিবিড় চাষে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম (Natural & Artificial) খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখানো হলো।

ব্যাপক পদ্ধতি (Extensive) ⟶

আধা-নিবিড় পদ্ধতি (Semi-intensive) ⟶

নিবিড় পদ্ধতি (Intensive) ⟶

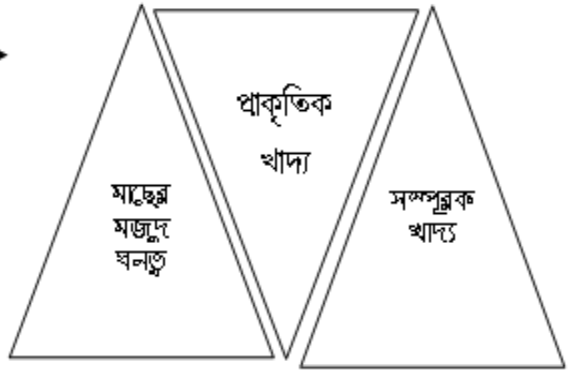

(২.৩) সম্পূরক খাদ্য ও সম্পূরক খাদ্যের উৎস

মাছ ও চিংড়ির পোনার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যেও পাশাপাশি বাইরে থেকে যে বাড়তি খাবার দেওয়া হয় সেগুলোকে সম্পূরক খাবার বলে। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছ ও চিংড়ি পোনার খাদ্যেও নির্দিষ্ট মাত্রায় সকল প্রকার পুষ্টি উপাদান থাকা প্রয়োজন। খাদ্যে এসব পুষ্টি উপাদানের কোনটি প্রয়োজনীয় মাত্রায় না থাকলে মাছ ও চিংড়ির পোনার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে মাছ চাষ করতে হলে মাছের মজুদ ঘনত্ব বাড়াতে হবে। এ অবস্থায় প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করা যাবেনা। নিবিড় মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করলে মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি পরিপূর্ণভাবে সাধন হয়। এতে মোট উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। কার্প জাতীয় প্লাঙ্কটনভোজী মাছ যথা- রুই, কাতলা, মৃগেল, কমনকার্প এবং চিংড়ি, এছাড়াও তৃণভোজী গ্রাস প্রভৃতি মাছ সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া বাণিজ্যিকভাবে চাষযোগ্য প্রজাতির মাছের চাষের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিদিন দেহ ওজনের নির্দিষ্ট মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

(২.৪) সম্পূরক খাদ্যের উৎসঃ

মাছ ও চিংড়ির চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সম্পূরক খাদ্য/উপকরণ ব্যবহার করা হয়। উৎস অনুযায়ী এসব খাদ্য উপকরণকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-(ক) উদ্ভিদজাত (খ) প্রাণিজাত।

(ক) উদ্ভিদজাত ঃ চাউলের মিহি কুঁড়া, গমের ভূষি,চালের খুদ, আটা, চিটা গুড়, সরিষার খৈল, তিলের খৈল,সয়াবিনের খৈল, তিসির খৈল, তুলা বীজ খৈল, ভূট্টা, কলাপাতা, তুঁত পাতা, ক্ষুদিপানা, মিষ্টি কুমড়ার পাতা, ইপিল ইপিল, নেপিয়ার ঘাস ইত্যাদি।

(খ) প্রাণিজাত ঃ ফিসমিল, চিংড়ির মাথার গুড়া, কাঁকড়ার গুড়া, শামুকের মাংস, গবাদি পশুর রক্তের গুড়া (ব্লাড মিল), বোন মিল, মিট ও বোন মিল ইত্যাদি।

এছাড়া পুষ্টিমান বাড়ানোর জন্য ভিটামিন প্রিমিক্স, কনসেন্ট্রেটেড প্রোটিন, সিনথেটিক অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড ব্যবহার করা হয়।

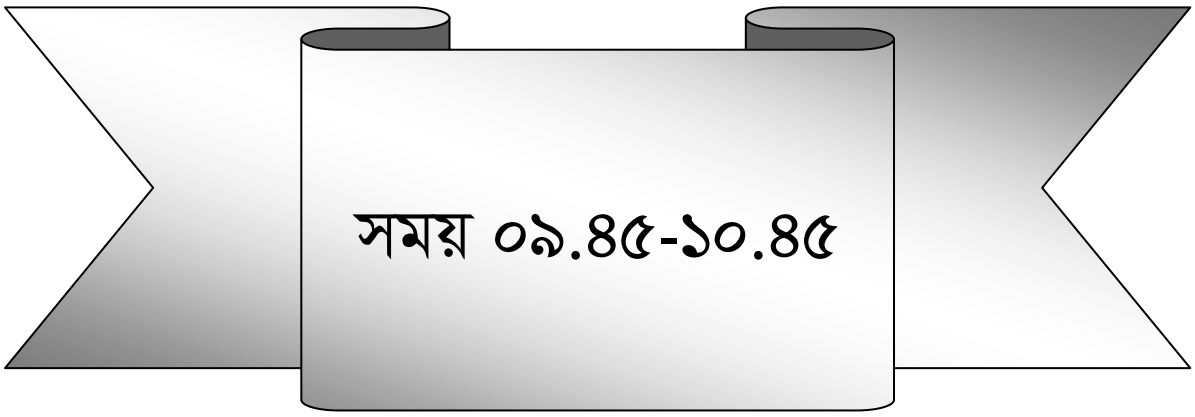

- বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য, এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ ও তাদের পুষ্টিমান

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময় ০৯.৪৫-১০.৪৫	**মেয়াদকাল:** ৬০ মিনিট

শিরোনাম: বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য, এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ ও তাদের পুষ্টিমান

অভীষ্ট দল: উদ্যোক্তাগণ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ এবং তাদের পুষ্টিমান সম্পর্কে অবহিত করা হবে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়িক জীবনে এই জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

উদ্দেশ্যঃ *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য সম্পর্কে জানবেন।
- স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
- মৎস্যখাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান সম্পর্কে জানবেন।
- সম্পূরক খাদ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০মিনিট
	• বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য • স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ • মৎস্যখাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান • সম্পূরক খাদ্য ও খাদ্য উপাদান	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			৫মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ভিপকার্ড, ভিডিও ক্লিপ, ল্যাপটপ, ইত্যাদি।			

বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভাস ও খাদ্য এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ এবং তাদের পুষ্টিমান

(প্রধানত প্রশিক্ষকের জন্য কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)

১.বাংলাদেশে চাষকৃত মাছের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য

বাংলাদেশের স্বাদু পানিতে প্রায় ২৬৫ প্রজাতির মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এ ছাড়াও বর্তমানে আরও ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই চাষ হচ্ছে। এসকল মাছকে খাদ্য গ্রহণের উপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। (ক) উদ্ভিদভোজী (Herbivore)- যেসকল মাছ শুধুমাত্র উদ্ভিদ জাতীয় খাবার খায় যেমন-সিলভার কার্প; (খ) মাংসাশী বা প্রাণীভোজী (Carnivore)- যেসকল মাছ শুধুমাত্র প্রাণী জাতীয় খাবার খায় এবং এরা মূলত: রাক্ষুসে প্রকৃতির যেমন- শোল, চিতল, বোয়াল ইত্যাদি; (গ) সর্বভূক (Omnivore) যেসকল মাছ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় জাতীয় খাবার খায় যেমন- তেলাপিয়া, কৈ, শিং, মাগুর ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্ত মাছ ও চিংড়ির সবগুলোই পুকুরে লাভজনকভাবে চাষযোগ্য নয়। অধিক উৎপাদন প্রাপ্তি ও লাভজনকভাবে চাষ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মাছের প্রজাতি নির্বাচন করা উচিত-

- পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের যথার্থ ব্যবহারে সক্ষম
- স্বল্পমূল্যের ও সহজলভ্য সম্পূরক খাদ্য খায়
- খাদ্য শিকল ছোট এবং দ্রুত বর্ধনশীল
- রাক্ষুসে স্বভাবের নয়
- এলাকাগত চাহিদা ও বাজারদর ভাল
- বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক
- পোনার সহজ প্রাপ্যতা
- অন্য প্রজাতির সাথে খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে না।

২. বাংলাদেশে লাভজনকভাবে চাষযোগ্য মাছের প্রজাতিসমূহঃ

উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে লাভজনকভাবে চাষযোগ্য প্রজাতিগুলো হচ্ছে-

দেশী কার্প	বিদেশী কাপ	অন্যান্য
কাতলা	গ্রাসকার্প	থাই/ভিয়েতনামী পাঙ্গাশ
রুই	সিলভার কার্প	থাই/ভিয়েতনামী কৈ
মৃগেল	কমন কার্প (কার্পিও, মিরর কার্প)	তেলাপিয়া
কালবাউশ	সরপুঁটি	শিং, মাগুর, পাবদা ও গুলশা

চাষযোগ্য প্রজাতির মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসঃ

(১) রুই (*Labeo rohita*)

রুই মাছ সাধারণভাবে পানির মধ্যস্তরে বিচরণ করে এবং এস্তরে বিদ্যমানে খাদ্যগ্রহণ করে থাকে। তবে পানির উপর এবং নিচের স্তরেও রুইয়ের অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রাণি- প্লাঙ্কটন, পঁচা জৈব পদার্থ ও ছোট কীট প্রাকৃতিক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আর সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ফিশ মিল, খৈলের গুঁড়া, চালের কুড়া, গমের ভূষি গ্রহণ করে। তৈরিকৃত ২১-২৮% আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্যও খেয়ে থাকে।

(২) কাতলা (*Catla catla*)

কাতলা সাধারণভাবে পানির উপর স্তরে বিচরণ করে। এরা ছোট অবস্থায় প্রধানত উদ্ভিদ-পাঙ্কটনভোজী। তবে কৈশোরের পর থেকে পুকুরের পরিবেশ থেকে শেওলা, ছোট কীট, উদ্ভিদের খন্ডাংশ, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে গমের ভূষি, চালের কুঁড়া, ফিশমিল, খৈল গ্রহণ করে।

(৩) মৃগেল (*Cirrhinus mrigala*)

মৃগেল মাছ জলাশয়ের তলদেশে স্তর থেকে খাদ্যগ্রহণ করে। প্রাণি-প্লাঙ্কটন, তলার ছোট/বড় কীট-পতঙ্গ, পঁচা জৈব পদার্থ, কাদা, বালি ইত্যাদি মৃগেলের খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুঁড়া, ফিসমিল, গমের ভূষি, সরিষার খৈল ইত্যাদি খায়।

(৪) কাল বাউশ *(Labeo calbasu)*

কালবাউশ নিচের স্তরে বাস করে এবং নিচের স্তরেই খাদ্য সংগ্রহ করে। পরিণত বয়সে পঁচা ও অর্ধপচা জলজ উদ্ভিদ এবং কীটপতঙ্গ খায়। পোনা অবস্থায় এককোষী শেওলা, পচা ও অর্ধপচা জলজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে। এছাড়া এমাছটি সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া, ফিসমিল, গমের ভূষি, সরিষার খৈল ইত্যাদি খায়।

(৫) গ্রাস কার্প *(Ctenopharyngodon idelle)*

গ্রাসকার্প প্রধানত তৃণভোজী স্বাভবের। পোনা অবস্থায় এরা প্রাণিপ্লাঙ্কটন ও মশার লার্ভা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয় এবং পুকুরের পরিবেশ থেকে ঝাঁঝি, হাড্রিলা, স্পাইরোডেলা, ক্ষদি পানা, কুটি পানা, নরম ঘাস ইত্যাদি খেতে শুর করে। বাইরে থেকে সরবরাহকৃত কলার পাতা, আলুর পাতা, সজনে পাতা, শীতকালীন শাকশব্জি খেতে ও এরা বেশ পছন্দ করে। গ্রাসকার্প দৈনিক দেহের ওজনের প্রায় ৪০-৫০% উদ্ভিদ জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সম্পূরক খাদ্যও গ্রাস কার্প গ্রহণ করে।

(৬) সিলভার কার্প *(Hypophthalmicththys molitrix)*

অপেক্ষাকৃত ছোট পোনা সাধারণত প্রাণি-প্লাঙ্কটন খেতে অভ্যস্ত। পোনার আকার কিছুটা বড় হলে এরা উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন খেয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে এবং বাকি জীবন প্রধানত উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন খেতে খুবই পছন্দ করে।

(৭) কার্পিও *(Cyprinus carpio)*

পুকুরের তলদেশ থেকে এ মাছ খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্যের জন্য এরা পুকুরের তলদেশ, পাড় ও চারপাশের মাটি খামচে আলগা করে। রেণু অবস্থায় এরা প্রাণি-প্লাঙ্কটন ভক্ষণ করে। পরিণত বয়সে প্লাঙ্কটন, ছোট/বড় কীট, ছোট, শামুক, কেঁচো, পচা জৈব পদার্থ, কাঁদার মধ্যে জন্মানো কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। কার্পিও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া, ফিসমিল, গমের ভূষি, সরিষার খৈল ইত্যাদিও খায়।

(৮) সরপুঁটি *(Puntius gonionotus)*

মাছের খাদ্যরুপে পরিচিত যে কোন ধরণের খাবারই সরপুঁটি খেতে পারে। রেণু অবস্থায় এরা এককোষী শেওলাও ছোট প্রাণি-প্লাঙ্কটন খায়। পরিণত অবস্থায় এরা উদ্ভিদভোজী। উদ্ভিদ হিসেবে ক্ষুদি পানা, হাইড্রিলা, নরম ঘাস, পেঁপে পাতা, আলু পাতা, বাধাঁকপি ইত্যাদি এদের খুবই প্রিয় খাদ্য। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুড়া ও সরিষার খৈল পছন্দ করে।

(৯) পাংগাস *(Pangasius sutchi)*

পাঙ্গাশ মাছ সর্বভুক। জলাশয়ের পরিবেশ থেকে এরা উদ্ভিদপ্লাঙ্কটন -, প্রাণি-প্লাঙ্কটন, তলদেশের পোকা-মাকড়, কেঁচো শামুক, পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পুকুরে চাষকালে খাদ্য হিসেবে খৈল, কুড়া, ভুসি, ফিশমিল, পশুর রক্ত ও নাড়িভূড়ি ইত্যাদি খেতে খুবই পছন্দ করে।

(১০) তেলাপিয়া

তেলাপিয়া পুকুরের সকল স্তরে বসবাস করে। এটি একটি সর্বভুক শ্রেণীর মাছ।পুকুরে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো শ্যাওলা ও কীট পতঙ্গ খেয়ে তেলাপিয়া জীবন ধারণ করতে পারে। পোনাগুলো কিছুটা বড় হলে (১০-১২ গ্রাম) এরা প্লাঙ্কটন ও ক্ষুদ্র রটিফার জাতীয় প্রাণী পছন্দ করে। চাউলের কুঁড়া, সরিষার খৈলের চূর্ণ ও অন্যান্য সম্পূরক বা বাণিজ্যিক পিলেট খাদ্য পেলে এদের অতি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এ মাছের খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের পরিমাণ বেশি প্রয়োজন।

(১১) কৈ (*Anabas testudineus)*

কৈ মাছ সর্বভূক। জু-প্লাংকটন এর প্রধান খাদ্য। এরা ছোট অবস্থায় অতিক্ষুদ্র জলজ প্রাণী ও কীট পতঙ্গ খায় এবং বড় হলে পতঙ্গ ও তাদের শুককীট, শৈবাল, পোকা মাকড় পঁচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি খায়।চাউলের কুঁড়া, সরিষার খৈল চূর্ণ, মৎস্যচূর্ণ ও অন্যান্য সম্পূরক বা বাণিজ্যিক পিলেট খাদ্য পেলে এদেও অতি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এদের সম্পূরক খাদ্য তৈরীতে আমিষের পরিমাণ বেশী প্রয়োজন।

(১২) শিং মাছ (*Heteropneustes fossilis)*

শিং মাছ নিশাচর (Nocturnal) প্রাণী এরা রাত্রে খাবার গ্রহণের জন্য বিচরণ করে। এ মাছ সর্বভূক, প্রাকৃতিক উৎসে সাধারণত জলাশয়ের তলদেশের খাদ্য খায়। এছাড়া শিং মাছ তাদের জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে তৈরী খাবারও খেয়ে থাকে। তবে তাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্য গ্রহণে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

- ❖ রেণু পর্যায়ে: ক্ষুদ্র জলজ প্রাণিকণা (জুপ্ল্যাঙ্কটন) ও পোকা-মাকড়, আর্টেমিয়া, টিউবিফেক্স ইত্যাদিও এদের আকর্ষণীয় খাদ্য;
- ❖ কিশোর পর্যায়ে: জুপ্ল্যাঙ্কটন ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা-মাকড়, আর্টেমিয়া, টিউবিফেক্স ইত্যাদি;

❖ বয়োপাপ্ত অবস্থায়: জলজ পোকা-মাকড়, বেনথোস, ক্ষুদ্র চিংড়ি ও মাছ, পঁচা জৈব দ্রব্যাদি।

(১৩) মাগুর মাছ (*Clarias batrachus*)

মাগুর মাছ পোকা, শুককীট বা মুককীট জাতীয় প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে থাকে। কুঁড়া, গমের ভূষি ও অন্যান্য সম্পূরক খাদ্য খায়।

(১৪) পাবদা (*Ompok pabda* (Hamilton)

রেণু পোনার খাদ্য: হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম, রটিফেরা গ্রুপের জুও-প্ল্যাংকটন, কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম।

ধানী থেকে চারা পোনার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, রটিফেরা ও সাইক্লপস গ্রুপের জুও-প্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, মাছের রেনু ও ধানী পোনা, কানপোনা ও দারকিনার পোনা, ইত্যাদি।

- চারা পোনা থেকে বিক্রয় উপযোগি পাবদার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, কুচো চিংড়ি, কেঁচো, জলজ পোকা-মাকড়, শ্যাওলা ও পাতার নরম অংশ।
- পাবদা সর্বভূক ও বটম ফিডার (Bottom Feeder)
- আর্টিফিসিয়াল ভাসমান খাদ্য দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়।

(১৫) গুলশা (*Mystus Cavasius,* Hamilton)

- রেণু পোনার খাদ্য: হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম, রটিফেরা গ্রুপের জু-প্লাংকটন, কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম;
- ধানী থেকে চারা পোনার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, রটিফেরা ও সাইক্লপস গ্রুপের জুও- প্লাঙ্কটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, কীট-পতঙ্গ, ইত্যাদি;
- চারা পোনা থেকে বিক্রয় উপযোগি গুলশার খাদ্য: কাইরোনমিড লার্ভা, টিউবিফেক্স ওয়ার্ম, কুচোচিংড়ি, কেঁচো, জলজ পোকা-মাকড়, শ্যাওলা ও পাতার নরম অংশ;
- গুলশা সর্বভূক, বটম ফিডার (Bottom Feeder)। ২৪-৩২% আমিষ সমৃদ্ধ আর্টিফিসিয়াল ফিড দিয়ে বাণিজ্যিক চাষ করা যায় যদিও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে এরা সরিষার খৈল, চালের কুড়া, ফিসমিল খায়।

(১৬) গলদা চিংড়ি *(Macrobrachium rossenbergii)*

গলদা চিংড়ি পানির তলদেশে বিচরণ করে এবং সেখানকার জীবিত ও মৃত বিভিন্ন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ বস্তু এরা ভক্ষণ করে। এ কারণে খাদ্য স্বাভাবে এরা সর্বভুক। প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যমান ছোট ছোট অমেরুদন্ডী প্রাণী, কুঁচো চিংড়ি, ছোট শামুক, পোকা-মাকড় ও লার্ভা কৃমি, শেওলা উদ্ভিদের টুকরো এদের প্রিয় খাদ্য। এরা খাদ্য সংগ্রহ করে বড় পায়ের দাঁড়ার সাহায্যে এবং খাদের উপস্থিতি অনুভব করে এন্টিনার সাহায্যে। পানিতে স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব থাকলে সবল চিংড়ি দুর্বল চিংড়িকে খেয়ে ফেলতে পারে। বিশেষ করে খোলস বদলের সময় এ ধরনের স্বজাতিভোজীতা বেশী দেখা যায়।

প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও এরা কুড়া, ভুসি, দানাদার শস্য, খৈল, ফলের টুকরো, মাছের গুঁড়া, গবাদিপশুর রক্ত, শামুক-ঝিনুকের মাংস খেতে পছন্দ করে।

৩. স্থানীয়ভাবে সহজ প্রাপ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণ

মৎস্যখাদ্য উপকরণ

মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণির চাষে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য উপকরণ সম্পূরক খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। উৎস অনুযায়ী এ সব উপকরণকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা: (ক) উদ্ভিদজাত ও (খ) প্রাণিজাত

(ক) উদ্ভিদজাতঃ চালের মিহি কুঁড়া, গমের ভূষি, ভূট্টার চূর্ণ, চালের খুদ, আটা, চিটা গুড়, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, লাউপাতা, তুঁত পাতা, ক্ষুদিপানা, মিষ্টি কুমড়ার পাতা, ইপিল ইপিল, নেপিয়ার ঘাস, ইত্যাদি।

(খ) প্রাণিজাতঃ ফিসমিল, পোল্ট্রিমিল, চিংড়ির মাথার গুড়া, কাঁকড়ার গুড়া, শামুকের মাংস, গবাদি পশুর রক্ত, পশুর নাড়িভূড়ি, মুরগির উচ্ছিষ্ট, মিট এন্ড বোন মিল, হাড় চূর্ণ ইত্যাদি।

(১) সরিষার খৈল

মৎস্য খাদ্যে আমিষের উদ্ভিজ্জ উৎস হিসেবে সরিষার খৈল ব্যবহার করা হয়। সরিষার খৈলে ৩০-৩৫% আমিষ, ৮-১৪% চর্বি এবং ৩০-৪০% শর্করা থাকে। সরিষার খৈল-এ পুষ্টি বিরোধী উপাদান গ্লুকোসাইনোলেট থাকে যা মাছের বৃদ্ধিকে ব্যহত করে। মৎস্য খাদ্যে সর্বোচ্চ ২০% সরিষার খৈল ব্যবহার করা যায়। ১২-১৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপরে ভাসমান তেলসহ পানি ফেলে দিলে পুষ্টি বিরোধী উপাদান গ্লুকোসাইনোলেটের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(২) রাইস ব্র্যান

রাইস ব্রান শর্করার সর্বোত্তম উৎস। রাইস ব্রানে কিছুটা তুষ (Husk) থাকলেও এতে শর্করার পাশাপাশি পর্যাপ্ত তৈল থাকে। চাউলকে মসৃণ করার সময় যে উপজাত বের হয় তাই রাইস পলিশ নামে পরিচিত। এতে তুষের (Husk) পরিমাণ কম থাকে কিন্তু শর্করার পরিমাণ বেশি ও আমিষ এবং তৈলের পরিমাণ কিছুটা কম থাকে। অটো কুঁড়ায় ১০-১৪% আমিষ, ১৫-১৮% চর্বি, ৪৫-৫০% শর্করা থাকে। মৎস্য খাদ্যে তৈরিতে সর্বোচ্চ ৭৫% রাইস ব্রান ব্যবহার করা যায়।

(৩) তেল নিষ্কাশিত চালের কুঁড়া (De-oiled rice bran)

বর্তমানে মৎস্য খাদ্য তৈরিতে তেল নিষ্কাশিত চালের কুঁড়ার বেশ ব্যবহার হচ্ছে। এর আমিষের মাত্রা বেশি প্রায় ১৭%। তবে তেল নিষ্কাশিত চালের কুঁড়া দিয়ে মাছের খাবার বানালে আলাদা ভাবে তৈল এবং পিলেট মসৃণ এবং দৃঢ় (Bindness) করার জন্য বর্ধিত মাত্রায় শর্করা ব্যবহার করা হয়।

(৪) সয়াবিন

মৎস্য খাদ্যের মূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য আমিষের উৎস হিসাবে সয়াবিন, সয়াবিনের উপজাত ব্যবহার সারা পৃথিবীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সয়াবিন তিন রুপে মৎস্য খাদ্য তৈরিত ব্যবহৃত হয়। মাঠ থেকে আহরিত সয়াবিন দানা, সোবিনের তৈল আহরণের পর উপজাত সয়াবিনের খৈল এবং গাজনকৃত সয়াবিন হাইপ্রো নোমে পরিচিত। দানা সয়াবিনে আমিষের পরিমাণ ২৫% এবং দানাদার সয়াবিনে ১৬% ফ্যাট থাকে যা থেকে তৈরিকৃত মৎস্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় ফ্যাটের উৎস্য হিসাবে কাজ করে। সয়াবিনের খৈলে ৪৩% আমিষ থাকে যা মাছের খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। হাইপ্রো সয়াবিনে আমিষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (৪৯%) থাকে এবং হাইপ্রো সয়াবিন সাধারণ সয়াবিন খৈলের চেয়ে কম আঁশযুক্ত, তাই এটি সহজে হজম হয়।

(৫) ভূট্টা

বর্তমান সময়ে মৎস্য খাদ্য তৈরিতে ভূট্টার চূর্ণ ব্যবহারের পাশা-পাশি উন্নতমানের চোলাইকৃত (Farmented) ভূট্টার উপজাত যেমন কর্ন গ্লুটেন মিল (সিজিএম) যার আমিষের পরিমাণ প্রায় ৬৭% এবং ডিডিজিএস যার আমিষের পরিমাণ প্রায় ৩০% এবং এসকল দ্রব্য ব্যবহারে উৎপাদিত খাদ্যে আমিষের মান সমুন্নত হয়। সিজিএম এবং ডিডিজিএস মৎস্য খাদ্যে আমিষের উৎস্য হিসেবে ব্যবহার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৬) ফিসমিল

মাছ বা মাছের অংশ বিশেষ বা উভয়ই পরিস্কার-পরিছন্ন করে শুকানোর পর চূর্ণ করে ফিশমিল তৈরি করা হয়। ফিশ মিল উচ্চ আমিষ, চর্বি, অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড, খনিজ উপাদান, ভিটামিন সমৃদ্ধ। ফিশমিলে প্রায় ৬০-৬৫% আমিষ, ১০-১২% চর্বি থাকে। ক্যাটফিশের খাদ্য তৈরিতে সর্বোচ্চ ৬০%, কার্পজাতীয় মাছের আঙ্গুলে পোনার খাদ্যে সর্বনিম্ন ১৫%, বড় মাছের জন্য সর্বনিম্ন ১২% জন্য ফিশমিল ব্যবহার করতে হয়। আমাদের দেশে ফিশমিলের উৎপাদন খুবই সীমিত। সাগরে ট্রলিং এর সময় ট্র্যাস ফিশ বা বাইক্যাচ মৎস্য ও মৎস্যজাত প্রাণি শুকিয়ে স্বল্প পরিমাণে শুটকি মাছ ফিশমিল হিসেবে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত ফিশমিলের অধিকাংশই বিদেশ হতে আমদানিকৃত।

(৭) ব্লাড মিল

পরিস্কার, সতেজ প্রাণীরক্ত থেকে ব্লাড মিল তৈরী করা হয় যাতে কোন লোম, নাড়িভুড়ি ইত্যাদি না থাকে। ব্লাড মিল বিভিন্ন ভাবে তৈরী করা হয় কিন্তু সাধারনত স্প্রে ড্রাই এর ম াধ্যমে তৈরি করা হয়। স্প্রে-ড্রাই এর মাধ্যমে উৎপাদিত ব্লাড মিলে প্রায় শতকরা ৮৫

ভাগ আমিষ, ০.৫ ভাগ চর্বি, শতকরা ২.৫ ফইবার, শতকরা ৬ ভাগ ছাই এবং লাইসিন শতকরা ৯-১১ ভাগ থাকে যার সহজপ্রাপ্যতা শতকরা ৮০-৯০ ভাগ।

(৮) মিট এ্যান্ড বোন মিল

মিট এ্যান্ড বোন মিল স্তন্যপায়ীর টিস্যূ হতে উদ্ভুত শুকনো পদার্থ যার মধ্যে লোম, শিং, খুর , পাকস্থলী ইত্যাদি থাকে। তুলনামূলকভাবে উচ্চ চর্বিযুক্ত মাংস এবং হাড় চুর্ণ প্রকৃতপক্ষে লাইসিনের উদ্ভুত হওয়াতে সাহায্য করে। মিট এ্যান্ড বোন মিলে সাধারণত শতকরা ৫০ ভাগ আমিষ, শতকরা ৮-১১ ভাগ চর্বি, শতকরা ৩ ভাগ ফাইবার শতকরা ৪.৪-৫ ভাগ ফসফরাস, শতকরা ৮.৮-১০ ভাগ ক্যালসিয়াম এবং শতকরা ৩০ ভাগ ভস্ম (ছাই) থাকে।

(৯)হাঁস-মুরগীর সিদ্ধ পাখনা

হাঁস মুরগীর পালক সংগ্রহ করে গুড়া করে সিদ্ধ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সিসটিনের বন্ধন ভেঙ্গে যাওয়ায় খাদ্যমান বৃদ্ধি পায়। পেপসিন দ্বারা ক্রুড প্রোটিনের কমপক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগ হজম হয়। সাধারনত সিদ্ধ করা মুরগীর পালকে শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ আমিষ, শতকরা ২.৫ ভাগ চর্বি, শতকরা ১.৫ ভাগ ফাইবার, শতকরা ০.৭৫ ভাগ ফসফরাস, শতকরা ৩ ভাগ ভস্ম (ছাই) থাকে।

(১০) বাইন্ডার (Binder বা বাঁধাইকারী)

মাছের খাদ্যের পানিতে স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং পুষ্টি উপাদানের পানিতে মিশে যাওয়া হতে রক্ষা করার জন্য পিলেট খাদ্য তৈরির সময় বাইন্ডার হিসেবে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার ব্যবহার করা হয়। ফিড গ্রেড ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট, ফিড গ্রেড মনোক্যালসিয়াম ফসফেট, জেলাটিন, কর্ন গ্লুটিন মিল, ফুড গ্রেড ব্যানানা পাউডার, ফুড গ্রেড কাসাভা পাউডার ইত্যাদি বাইন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(১১) সংরক্ষণকারী (Preservatives/**প্রিজারভেটিভস**)

মৎস্য খাদ্যের মান দীর্ঘ সময় ধরে ভাল রাখার জন্য (Shelf life) এবং খাদ্যের চর্বির ও বাতাসের বিক্রিয়ায় চর্বির পঁচন (Rancidity) হ্রাস করার জন্য প্রিজারভেটিভস ব্যবহার করা হয়। প্রিজারভেটিভস খাদ্যকে মাইক্রোবিয়াল একটিভিটি হতেও রক্ষা করে। ফলে খাদ্যের শেলফ লাইফ বা মান দীর্ঘ সময় ধরে ভালো থাকে। প্রোপায়োনিক এবং বেনজোয়িক এসিডের সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম লবণ ০.১% হারে মৎস্য খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

(১২) এ্যাট্রাকট্যান্ট (আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বস্তু বা মনোহরকারী)

মাছের খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি ও খাদ্য গ্রহণের হার বৃদ্ধির জন্য এ্যাট্রাকট্যান্টস ব্যবহার করা হয়। ফিস হাইড্রোসাইলেটস, কনডেন্সড ফিস সলিবোলস মৎস্য খাদ্যে ৫% হারে ব্যবহৃত হয়।

(১৩) বৃদ্ধি রোধক (Growth Inhibitor) উপাদান

সরিষার খৈল-এ পুষ্টি বিরোধী উপাদান গ্লুকোসাইনোলেট থাকে যা মাছের বৃদ্ধিকে ব্যহত করে। অন্যান্য উদ্ভিদ উৎসের উপকরণে গোসিপোল, স্যাপোনিন, ট্রিপসিন, ইত্যাদি বৃদ্ধিরোধক ফ্যাক্টর থাকে। এসকল বৃদ্ধিরোধক ফ্যাক্টরকে অপসারণ/অকার্যকর করার জন্য ভিবিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয় যেমন- ভিজানো, তাপ প্রয়োগ এবং রান্না করা। উদাহরণ- সরিষার খৈল ১২-১৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ব্যবহার করলে গ্লুকোসাইনোলেটের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

৪. স্থানীয়ভাবে সহজ প্রাপ্য মৎস্যখাদ্য উপকরণসমূহের পুষ্টিমানঃ

মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কুচিয়াসহ অন্যান্য চাষকৃত জলজ প্রাণির কাংখিত বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি সম্পূরক খাবার দেওয়া অপরিহার্য। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কুচিয়ার খাদ্যের নির্দিষ্ট মাত্রায় সকল পুষ্টি উপাদান থাকা প্রয়োজন। খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমূহ সঠিক মাত্রায় না থাকলে চাষকৃত জলজ প্রাণির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণির চাষ করতে হলে সঠিক মজুদ ঘনত্ব রক্ষা করতে হবে। প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে বাণিজ্যিক মাছচাষ সম্ভব নয়। জলজ প্রাণির নিবিড় মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার অপরিহার্য।

সম্পূরক খাদ্যের উপাদানসমূহ

বিভিন্ন মাছের প্রজাতি, আকার, জীবন-চক্রের বিভিন্ন দশা, ঋতু প্রভৃতি বিবেচনা করে সম্পূরক খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের মাত্রা ঠিক করতে হয়। মাছের দেহ গঠন, শক্তি উৎপাদন এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আমিষ (Protein), চর্বি (Lipids/Fat), শর্করা (Carbohydrates), ভিটামিন (Vitamins) এবং খনিজ লবণ (Minerals) অতীব প্রয়োজনীয়।

(১) আমিষ

প্রাণী দেহ কলা বৃদ্ধির জন্য আমিষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমিষ হজম হওয়ার প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে অ্যামাইনো এসিডে রূপান্তরিত হয়ে শরীরের ক্ষয়পুরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে থাকে। এছাড়া প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও আমিষ প্রয়োজন। তবে আমিষ শক্তিও দিয়ে থাকে। ১ গ্রাম আমিষ হতে ৪.৩ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। মাছের ভালো বৃদ্ধির জন্য আমিষের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে খাদ্যস্থ আমিষের গুণাগুন, আমিষের উৎস্য, মাছের প্রজাতি, বয়স, আকার এবং খাদ্যস্থ শক্তির পরিমাণের ওপর । এবই প্রজাতির মাছের ক্ষেত্র বিভিন্ন বয়স ও আকারে আমিষের পরিমাণের ভিন্ন হয়। যেমন তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় লার্ভার (প্রথম খাদ্য গ্রহণকারি লার্ভা অবস্থায়) ক্ষেত্রে খাদ্যে আমিষের প্রয়োজনীয়তা শতকরা ৪৫-৫০ ভাগ; রেণু ও আঙ্গুলি পোনার (০.০২-১০.০ গ্রাম) ক্ষেত্রে শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ; কিশোর অবস্থায় (১০-২৫ গ্রাম) শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ এবং বাড়ন্ত (গ্রোয়ার) অবস্থার ক্ষেত্রে ২৮-৩০ ভাগ আমিষের প্রয়োজন। তেলাপিয়ার ব্রুড মাছের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সর্বোচ্চ প্রজনন ক্ষমতা এবং ডিম দেওয়ার সর্বোচ্চ দক্ষতার জন্য খাদ্যে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ আমিষের প্রয়োজন। প্রকৃতিতে ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়, এদের মধ্যে মাছের ১০টি অ্যামাইনো এসিড অত্যাবশ্যকীয়, যেগুলো মাছ তার শরীরে উৎপাদন করতে পারে না। ফলে সে সমস্ত অ্যামাইনো এসিড বাহির থেকে প্রদত্ত খাদ্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। এ সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো হলো- আর্জিনাইন, হিষ্টিডাইন, আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, মিথায়োনাইন, ফিনাইল অ্যালালাইন, থ্রিয়োনাইন, ট্রিপটোফেন এবং ভেলাইন। আমিষ প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয় উৎস থেকেই পাওয়া যায়। তবে প্রাণী উৎস থেকে প্রাপ্ত আমিষ সহজেই হজম হয়। অপর দিকে উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত আমিষের পরিমাণ খুবই কম। তবে প্রাণী এবং উদ্ভিদজাত আমিষের সংমিশ্রণে তৈরি খাদ্য সুষম খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মাছের সুষম দেহবৃদ্ধির জন্য ৩০-৩৫% আমিষ থাকা প্রয়োজন। ফিস মিল, মিট এন্ড বোন মিল, পোল্ট্রিমিল, সয়াবিন মিল ও তৈল বীজজাত খৈল মাছের খাদ্যের আমিষের প্রধানতম উৎস।

তবে প্রাণিজ উৎসের উপকরণ দ্বারা মৎস্য খাদ্য তৈরিতে খরচ বেশি হওয়ায় বর্তমানে মৎস্য খাদ্য তৈরিতে উদ্ভিজ্জ উৎসের উপকরণ ব্যবহার বাড়ছে। আমিষের উদ্ভিজ্জ উৎস হিসেবে সাধারণত সরিষার খৈল, সয়াবিন মিল ও অন্যান্য তৈল বীজের খৈল ব্যবহৃত হয়। তবে উদ্ভিদজ্য উৎসের উপকরণে অত্যাবশ্যকীয় সকল অ্যামাইনো এসিডের উপস্থিতি না থাকায় মাছের উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিশেষ করে মিথিওনিন এবং লাইসিন এর মাত্রা কম থাকে। সুষম খাদ্য তৈরিতে সকল উপাদানের সমন্বয় সাধনের জন্য বা তৈরি খাদ্যের গুণগতমানের উন্নয়নের জন্য বিভিন্নধরনের সিনথেটিক অ্যামাইনো এসিড পরিপূরক (Suplimentary) হিসাবে খাদ্যের সূত্রে (Feed formulation) অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এর ফলে খাদ্য উপকরণে বিদ্যমান অন্যান্য অ্যামাইনো এসিডের কার্যক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে। বর্তমানে আলাদাভাবে এক বা একাধিক অত্যাবশ্যকীয় অ্যামানো এসিড যোগ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত মিথিওনিন ও লাইসিন ব্যবহার করা হয় তবে অনেকে থ্রিওনিন ও ভেলিনও ব্যবহার করে থাকেন। মাছের খাদ্যের দাম কমানোর জন্য আমিষের উৎস্য হিসেবে উদ্ভিদজ্য উপকরণ ব্যবহার বৃদ্ধি করে আলাদাভাবে কৃত্রিম (সিনথেটিক) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের ব্যবহারের ফলে খাদ্যের দাম কমানো সম্ভব হচ্ছে এবং খাদ্যে পুষ্টিমান বজায় থাকছে। অনেকে বর্তমান সময়ে মৎস্য খাদ্য তৈরিতে উন্নতমানের চোলাইকৃত (Farmented) ভূট্টার উপজাত যেমন কর্ন গ্লুটেন মিল (সিজিএম) যার আমিষের পরিমাণ প্রায় ৬৭% এবং ডিডিজিএস (Corn distillers dried grains with solubles-DDGS)) যার আমিষের পরিমাণ প্রায় ৩০% এবং এসকল দ্রব্য ব্যবহারে উৎপাদিত খাদ্যে আমিষের মান সমুন্নত হয়। সম্পূরক খাদ্য উৎপাদনে আমিষের ভূমিকা সর্বাধিক এবং আমিষের পরিমাণ কম বেশির উপর মাছের খাদ্যের মূল্য হার অনেকাংশে নির্ভর করে। খাদ্যের মূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য আমিষের উৎস হিসাবে সোয়াবিন, সয়াবিনের উপজাত ব্যবহার সারা পৃথিবীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সয়াবিন তিন রুপে মৎস্য খাদ্য তৈরিত ব্যবহৃত হয়। মাঠ থেকে আহরিত সয়াবিন দানা, সয়াবিনের তৈল আহরণের পর উপজাত সয়াবিনের খৈল এবং গাজনকৃত সয়াবিন হাইপ্রো নোমে পরিচিত। দানা সয়াবিনে আমিষের পরিমাণ ২৫% এবং দানাদার সয়াবিনে ১৬% ফ্যাট থাকে যা থেকে তৈরিকৃত মৎস্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় ফ্যাটের উৎস হিসাবে কাজ করে। সয়াবিনের খৈলে ৪৩% আমিষ থাকে যা মাছের খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। হাইপ্রো সয়াবিনে আমিষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (৪৯%) থাকে এবং হাইপ্রো সয়াবিন সাধারণ সয়াবিন খৈলের চেয়ে কম আঁশযুক্ত, তাই এটি সহজে হজম হয়।

(২) চর্বি

চর্বি বা ফ্যাট প্রাণিদেহে শক্তি সরবরাহ করে থাকে। ১ গ্রাম চর্বি হতে ৯.১ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায় । রোগ-জীবাণুর আক্রমণ হতে প্রাণিকে রক্ষা করে। যেমন ত্বকের উপরিভাগের চর্বি জীবাণুর সংক্রমণ হতে দেহকে রক্ষা করে। চর্বিতে দ্রবীভূত ভিটামিনস (ভিটামিন এ, ডি, ই এবং তে) আত্তীকরণের জন্য চর্বি প্রয়োজন। চর্বি অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের যোগান দেয়, যা মাছের শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে থাকে। অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড সমূহ হলো- মাছের জন্য লিনোলিনিক এসিড ও লিনোলিক এসিড এবং চিংড়ির জন্য কোলেস্টেরোল ও লিসিথিন। মেরিন ফিস লিভার অয়েল, ভূট্টা, নারিকেল, সোয়াবিন, ইত্যাদি মৎস্য খাদ্যের চর্বির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চর্বি বেশি দিন সংরক্ষণ করলে চর্বির গঠন ভেঙ্গে (Rancidity) খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয়। এরুপ চর্বি দ্বারা মাছের খাবার তৈরি করলে খারাপ গন্ধের কারণে উত্তম আমিষ সমৃদ্ধ খাবার হলেও মাছে তা অনেক সময় গ্রহণ করে না। এজন্য চর্বি বা তৈল বেশি দিন গুদামজাত করে রেখে মৎস্য খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

(৩) শর্করা

শর্করা স্বল্প মূল্যের খাদ্য যা মাছের শক্তি উৎপাদনে সহায্য করে থাকে। সেলুলোজ জাতীয় শর্করা খাদ্য মাছ সহজে হজম করতে পারে না। কার্পজাতীয় মাছের দেহের শক্তি উৎপাদনের জন্য ২৫% শর্করার প্রয়োজন। এক গ্রাম শর্করা পোড়ালে ৪.১ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। গমের ভূষি, চাউলের কুঁড়া, ইত্যাদি শর্করার উদাহরণ। বাজারে সাধারণত তিন ধরনের চাউলের কুঁড়া পাওয়া যায়, যথা- ডি অয়েল রাইস ব্রান (ডিওআরবি-তৈল অপসারণের পর), রাইস ব্রান ও রাইস পলিশ। বর্তমানে ডিওআরবি মৎস্য খাদ্য তৈরিতে বেশ ব্যবহার হচ্ছে। এর আমিষের মাত্রা বেশি ১৭% প্রায়। তবে ডিওআরবি দিয়ে মাছের খাবার বানালে আলাদা ভাবে তৈল এবং পিলেট মসৃণ এবং দৃঢ় (Bindness) করার জন্য বর্ধিত মাত্রায় শর্করা ব্যবহার করা হয়।যদিও মাছের ক্ষেত্রে শর্করার প্রয়োজণীয় পরিমাণ জানা নাই। তবে দেখা গেছে তেলাপিয়া সহজপাচ্য শর্করার শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে। মাছের শর্করার ব্যবহার বেশ কিছু প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন-শর্করার উৎস, খাদ্যের অন্যান্য উপকরণ, মাছের প্রজাতি, আকার এবং দৈনিক কতবার খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। মনো স্যাকারাইড এবং ডাই স্যাকারাইড এর তুলনায় মাছ জটিল শর্করা ভালোভাবে হজম করতে পারে।

সবদিক বিবেচনায় রাইচ ব্রাণ পুষ্টিগত দিক থেকে সর্বোত্তম। রাইচ ব্রানে কিছুটা তুষ (Husk) থাকলেও এতে শর্করার পাশাপাশি পর্যাপ্ত তৈল থাকে। চাউলকে মসৃণ করার সময় যে উপজাত বের হয় তাহাই রাইচ পলিশ নামে পরিচিত। এতে তুষের (Husk) পরিমাণ কম থাকে কিন্তু শর্করার পরিমাণ বেশি ও আমিষ এবং তৈলের পরিমাণ কিছুটা কম থাকে। চাউলের খুদ, গমের চূর্ণ, ভূট্টার চূর্ণ গমের মিহি ভূষি মৎস্য খাদ্যের শর্করার উৎস হিসাবে কাজে লাগে। ব্রুড মাছে দ্রুত ডিমের পরিপক্কতা আনায়নে চাউলের খুদ এবং রাইচ পলিশের ব্যবহার হয়ে থাকে কারণ এতে অধিক পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে। শর্করার অপ্রচলিত উৎস্য হিসেবে গোল আলু, মিষ্টি আলু, কাসাভা, শুকানো খুদি পানা বা কচুরিপানা, ইপিলিপিল গাছের পাতা ইত্যাদি মৎস্য খাদ্য উৎপাদনে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(৪) ভিটামিন

অন্যান্য প্রাণির মত মাছের দেহে শক্তি উৎপাদন, কোষ গঠন, রক্ত জমাট বাঁধা, রোগ প্রতিরোধে এবং ক্যালসিয়াম হজমে ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। সকল প্রাণির মত মাছেরও ভিটামিন লাগে কম মাত্রায় কিন্তু তা অত্যাবশ্যক। এর অনুপস্থিতিতে রোগের সংক্রমণ হয়। অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের কার্যকরী করার জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন স্বল্প পরিমাণ থাকে। বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন প্রকারের সিনথেটিক ভিটামিন তৈরি করে বিক্রয় করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন মিশ্রিতভাবে ভিটামিন প্রিমিক্স হিসাবে বিক্রয় হয়। সম্পূরক খাদ্যে তৈরিতে স্বল্প পরিমাণে এই ভিটামিনে প্রিমিক্স বাহির থেকে সংযুক্ত করা হয়। বিভিন্ন শাকসব্জি থেকে ভিটামিন পাওয়া যায়। এজন্য মাছকে কাচা সবজি মাঝে মধ্যে খেতে দেয়া ভাল।

(৫) খনিজ উপাদান

মাছের হাঁড়, আঁইশ ও দাঁত গঠন, রক্ত তৈরি এবং রক্তে P^H সংরক্ষণ সহ আরও নানাবিধ কাজে খনিজ উপাদান প্রয়োজন। ফিস মিল মাছের খনিজ উপদান সরবরাহে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাণির রক্তে বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত খনিজ লবণ থাকে। বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন প্রকারের খণিজ উপাদান তৈরি করে বিপণন করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের খনিজ উপাদান মিশ্রিতভাবে মিনারেল প্রিমিক্স হিসাবে বিক্রয় হয়। সম্পূরক খাদ্যে তৈরিতে স্বল্প পরিমাণে এই প্রিমিক্স বাহির থেকে সংযুক্ত করা হয়।

আমাদের দেশে মাছ ও চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত অধিক প্রচলিত খাদ্য উপকরণের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে এগুলোর মধ্যে উচ্চমানের পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। গবেষণায় প্রাপ্ত খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান নিচের সারণী-১ এ উল্লেখ করা হলো-

সারণী-১:মৎস্যখাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান

খাদ্য উপকরণের নাম	আমিষ	স্নেহ (চর্বি)	শর্করা	ক্যালরি/কেজি	ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা
প্রাণিজ উৎসের খাদ্য উপকরণ					
ফিশ মিল (এ গ্রেড)	৬০-৬৫	১০-১২	১-২	৪৭৫৪	৫০%
শ্রিম্প মিল (মাথা ও লেজ)	২০-৩০	৫-৮	২-৪	৩১৩২	৮%
মিট ও বোন মিল	৪০-৫০	১০-১৫	১-২	৪১১২	২৫%
বোন মিল	১০-৩০	২-৪	২০-৩০	৩৫৮৯	৫%
চিংড়ির গুড়া	৪৫-৭০	১-২	২-৫	৩৫৭৪	২৫%
ব্লাডমিল	৭০-৯০	০.৫-২.০০	১-৩	৪৩৯৪	১০%
ফিশ সাইলেজ	৪৫-৭০	১৫-২০	১০-১২	৪৭৮৪	৩০%
মিট মিল	৫০-৭০	১-৩	১-২	৪৭৮৫	৩০%
পোল্ট্রি অফাল মিল	৬০-৬৫	-	-	-	৩০%
হাঁস-মুরগীর উপজাত মিল	৫০-৬০	-	-	-	২০
উদ্ভিদ উৎসের খাদ্য উপকরণ					
চালের কুঁড়া (অটো)	১০-১৪	১৫-১৮	৪৫-৫০	৩৬৫০	৭৫%
গমের ভূষি (মিহি)	১২-১৬	৩-৬	৭০-৮০	৩৭৯৪	৫০%
ভূট্টা	৮-১০	৩-৪	৬৫-৭০	৩৮৫৪	২০%
গমের ময়দা	১২-১৪	২-৩	৭৫-৮০	৪৪৮৮	২০%
সয়াবিন মিল/কেক	২৪-২৬	১০-১৫	৩০-৩৫	৫৪৯৯	১০%
সয়াবিন মিল (তৈল নিষ্কাশিত)	৪০-৪৫	০.৫০-১.৫০	৩০-৪০	৪৯৫০	২৫%
সরিষার খৈল	৩০-৩৫	৮-১৪	৩০-৪০	৪১৭৮	২০%
রাই সরিষার খৈল	৩০-৪০	৬-১২	৩০-৩৫	৩৮২৮	২০%
তিসি বীজ খৈল	৩০-৪০	১০-১৫	৩০-৩৫	৪৭৫৩	২৫%
চিটা গুড়	৪-৫	-	৮০-৮৫	৩৬২৪	৫%(বাইন্ডার)
সিজিএম	৬৭.০০	৩.০৩	-	-	৫%(বাইন্ডার)
ডিডিজিএস	৩০.০০				৫%(বাইন্ডার)

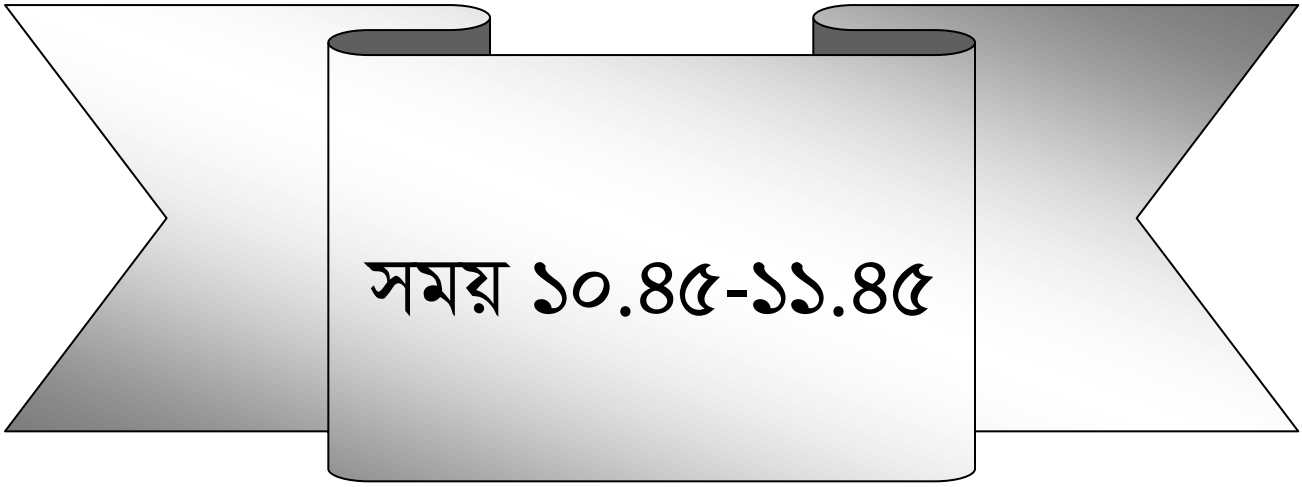

- খাদ্য তৈরির সূত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল ও প্রস্তুত প্রণালি, ও খাদ্য প্রয়োগ হার, এবং খাদ্যের কার্যকারিতা, ও খাদ্য রুপান্তর হার (এফসিআর)

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময় ১০.৪৫-১১.৪৫	**মেয়াদকাল:** ৬০ মিনিট

শিরোনাম: খাদ্য তৈরির সূত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল ও প্রস্তুত প্রণালি ও খাদ্য প্রয়োগ হার এবং খাদ্যের কার্যকারিতা ও খাদ্য রুপান্তর হার (এফসিআর)

অভীষ্ট দল: উদ্যোক্তাগণ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে খাদ্য তৈরির সূত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল ও প্রস্তুত প্রণালি ও খাদ্য প্রয়োগ হার এবং খাদ্যের কার্যকারিতা ও খাদ্য রুপান্তর হার (এফসিআর) সম্পর্কে অবহিত করা হবে,এর ফলে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়িক জীবনে এই জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে।

উদ্দেশ্যঃ *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- খাদ্য তৈরির সূত্র সম্পর্কে জানবেন।
- বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
- মাছের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি সম্পর্কে জানবেন।
- মাছের খাদ্য প্রয়োগ হার এবং খাদ্যের কার্যকারিতা জানবেন।
- খাদ্য রূপান্তর হার (এফসিআর) সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০মিনিট
	• খাদ্য তৈরির সূত্র • বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল • মাছের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি • মাছের খাদ্য প্রয়োগ হার এবং খাদ্যের কার্যকারিতা • খাদ্য রূপান্তর হার (এফসিআর)	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			৫মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ভিপকার্ড, ভিডিও ক্লিপ, ল্যাপটপ, ইত্যাদি।			

খাদ্য তৈরির সূত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল ও প্রস্তুত প্রণালি ও খাদ্য প্রয়োগ হার এবং খাদ্যের কার্যকারিতা ও খাদ্য রূপান্তর হার (এফসিআর)

(প্রধানত প্রশিক্ষকের জন্য কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)

১. মৎস্যখাদ্য তৈরির সূত্র ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্য প্রস্তুত মডেল

১.১ বাংলাদেশে চাষকৃত বিভিন্ন মাছের বয়সভিত্তিক খাদ্য তৈরির মডেল

মাছের খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বে যে মাছের খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে তার সঠিক পুষ্টি চাহিদা জানতে হবে। আবার একই সাথে একই প্রজাতির বিভিন্ন বয়সে পুষ্টি চাহিদা ভিন্নতর হয়। সাধারণত ছোট বয়সে (পোনা বা চারা পোনা) মাছের আমিষের চাহিদা বেশি থাকে এবং যতই বাড়তে থাকে খাদ্যে আমিষের শতকরা হার কমতে থাকে। চাষির আর্থিক সংগতি, উপকরণের সহজলভ্যতা এ বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিতে হবে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে খামারী বা মাছ চাষিদের সংগতি এবং পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবহারের অনুশীলন বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে চাষকৃত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা ও বড় মাছের খাবার উপযোগী স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপকরণ ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যের উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্যে তৈরির উপকরণের আনুপাতিক মাত্রা যা খাদ্য তৈরির মডেল আকারে নিম্নে দেয়া হলোঃ

সারণি- ১ঃ রুই জাতীয় মাছের পোনা ও মিশ্র চাষের সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির মডেল

উপকরণ	নার্সারি/স্টার্টার খাদ্য (৩০-২৮% আমিষ)		মিশ্র চাষের খাদ্য (২৫% আমিষ)	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিসমিল (এ গ্রেড)	২০.০০	১২.০০	১৫.০০	৯.০০
মিট ও বোন মিল	১২.০০	৬.০০	৫.০০	২.৫০
সরিষার/তিলের খৈল	২০.০০	৭.০০	২০.০০	৭.০০
চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	৪২.০০	৪.৫০	৪৪.৫০	৫.০০
ভুট্টা/আটা	৩.০০	০.৫০	১০.০০	১.৫০
চিটাগুড়	২.০০	-	৫.০০	-
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	০.০১	-	০.০১	-
মোট	১০০.০০	৩০.০০	১০০.০০	২৫.০০

সারণি-২ঃ তেলাপিয়ার পোনা ও বাড়ন্ত মাছের সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির মডেল

উপকরণ	নার্সারি/স্টার্টার খাদ্য (৩০-২৮% আমিষ)		বাড়ন্ত মাছের খাদ্য গ্রোয়ার/ফিনিসার) (২৫% আমিষ)	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিসমিল (এ গ্রেড)	১৫.০০	৯.০০	৯.০০	৫.৩০
মিট ও বোন মিল	১৫.০০	৭.৫০	১২.০০	৬.০০
সরিষার/তিলের খৈল	২০.০০	৭.০০	২০.০০	৭.০০
চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	৪৪.০০	৫.২৮	৫৩.০০	৬.০০
ভুট্টা/আটা	৫.৮০	০.৭০	৫.৮০	০.৭০
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	০.২০	-	০.২০	-
মোট	১০০.০০	২৯.৪৮	১০০.০০	২৫.০০

সারণি-৩ঃ পাঙ্গাস মাছের পোনা ও বাড়ন্ত মাছের সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির মডেল

উপকরণ	নার্সারি/স্টার্টার খাদ্য (৩৫-৩২% আমিষ)		মিশ্র চাষের খাদ্য (৩০-২৮% আমিষ)	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিসমিল (এ গ্রেড)	২৫.০০	১৫.০০	২০.০০	১২.০০
মিট ও বোন মিল	২০.০০	১০.০০	১৫.০০	৭.৫৫
সরিষার/তিলের খৈল	১৫.০০	৫.২৫	১৫.০০	৫.২৫
চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	২৫.০০	৩.১৫	৩৫.০০	৪.২০
ভুট্টা	১০.০০	১.০০	১০.০০	১.০০
আটা	৪.৮০	০.৬০	৪.৫০	-
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	০.২০	-	০.৫০	-
মোট	১০০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	৩০.০০

বি.দ্র. সাধারণভাবে দেখা যায় পাঙ্গাস অপেক্ষা শিং, পাবদা ও গুলসা ও কৈ মাছে আমিষের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে আমিষ-সমৃদ্ধ উপকরণের অনুপাত বৃদ্ধি করে খাবারে আমিষের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

সারণি-৪ঃ শিং, মাগুর, পাবদা, গুলসা ও কৈ মাছের পোনা ও বাড়ন্ত মাছের খাদ্য তৈরির মডেল

উপকরণ	নার্সারি/স্টার্টার খাদ্য (৪০% আমিষ)		বাড়ন্ত মাছের খাদ্য গ্রোয়ার/ফিনিসার) (৩৭% আমিষ)	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিসমিল (এ গ্রেড)	৪০.০০	২৪.০০	৩০.০০	১৮.০০
মিট ও বোন মিল	১০.০০	৫.০০	১০.০০	৫.০০
সরিষার খৈল	১৫.০০	৫.৪০	১৫.০০	৫.০০
তিলের খৈল/সয়াবিন খেল	১৫.০০	৪.৬০	২০.০০	৬.০০
চালের কুঁড়া/ভূট্টা	১৫.০০	১.০০	২০.০০	৩.০০
আটা/চিটাগুড়	৪.০০	-	৪.০০	-
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১.০০	-	১.০০	-
মোট	১০০.০০	৪০.০০	১০০.০০	৩৭.০০

সূত্র: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ময়মনসিংহ-২২০১। সম্প্রচারপত্র নং:৪১; প্রকাশকাল জুন ২০১৯

সারণি-৫ রুই জাতীয় মাছের পোনার জন্য প্রস্তুতকৃত ১০০ কেজি খাবারের সম্ভাব্য খরচ *(বর্তমান বাজার মূল্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে)*

ক্রমিক নং	উকরণের নাম	ব্যবহার মাত্রা (%)	পরিমান (কেজি)	প্রতি কেজির মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
১	ফিসমিল (এ গ্রেড)	২০	২০	৫০	১০০০	
২	মিট ও বোন মিল	১২	১২	৩৫	৭০০	
৩	সরিষার/তিলের খৈল	২০	২০	৩০	৬০০	
৪	চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	৪২	৪২	১০	৪২০	
৫	ভুট্টা/আটা	৩	৩	১৪	৪২	
৬	চিটাগুড়	২	২	২০	৪০	
৭	ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	০.১	০.১	৪০০	৪০	
মোট		১০০	১০০		২৮৪২	

১ কেজি খাবারের উপকরণ ক্রয় বাবদ খরচ হবে ২৮.৪২ টাকা। প্রতি কেজি খাবারের পিলেটিং খরচ ২ টাকা। যদি পিলেটিং করা হয় তাহলে প্রতি কেজি দানাদার খাদ্য তৈরিতে খরচ হবে ২৮.৪২+২.০০=৩০.৪২ টাকা

১.২ বিভিন্ন উপকরণের সমন্বয়ে কাংখিত আমিষ সমতাকরণে পিয়ারসন স্কয়ার সূত্রঃ

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মিশ্রনে মৎস্য খাদ্য তৈরি করতে গিয়ে সাধারণত একটা সমস্যা দেখা দেয়। সেটা হচ্ছে, কোন উপকরণ কত অনুপাতে মেশাতে হবে। খাদ্য উপকরণের অনুপাত মিললে খাদ্যে আমিষের শতকরা হার মেলে না, আবার আমিষের শতকরা হার মিললে খাদ্য উপকরণের অনুপাত মেলে না। এসব ক্ষেত্রে পিয়ারসন'স স্কয়ার মেথড ব্যবহার করে সঠিক মাত্রায় খাদ্য উপকরণগুলো যোগ করে নির্দিষ্ট হারের আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য অনায়াসে তৈরি করা যায়। অন্যান্য আনুপাতিক হিসাবের ক্ষেত্রেও পদ্ধতিটি সফলভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মৎস্য খাদ্য তৈরির জন্য খাদ্য প্রস্তুতকারক বা চাষিরা সাধারণত: ফিশ মিল, চাউলের কুড়া, গমের ভূষি, সয়াবিন মিল, সরিষার খৈল, ভুট্টার গুড়া, বোন ও মিট মিল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদিপানা, স্পাইরুলিনা প্রভৃতি ফিড সাপ্লিমেন্ট হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে যে উপকরণই ব্যবহার করা হোকনা কেন পিয়ারসন'স স্কয়ার পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি করতে হলে প্রতিটি উপকরণের আমিষের শতকরা হার সঠিকভাবে জানা থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে, নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এখানে চাষি/খামারির বাস্তবভিত্তিক কিছু সমস্যা ও তার সমাধান বর্ণনা করা হলো।

<u>সমস্যা নং- ১</u>

মনে করি, একজন মৎস্য চাষি/মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী সরিষার খৈল এবং গমের ভূষি সহযোগে একটি খাদ্য তৈরি করতে চায় যার আমিষের হার হবে ২৫%। তাহলে তাকে কোন উপকরণ কত অনুপাতে মেশাতে হবে। নিচের চিত্রটি লক্ষ করুনঃ

সরিষার খৈল-আমিষ ৩০%

গমের ভূষি-আমিষ ১৪%

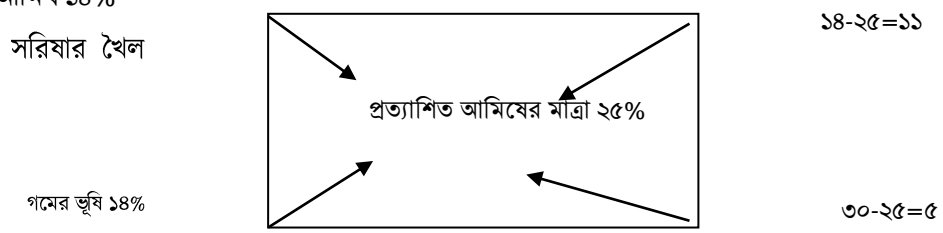

সূত্রঃ পিয়ারসন্স স্কয়ার মেথডে খাদ্য তৈরির সূত্র

সরিষার খৈল মেশাতে হবে = ১৪-২৫ = ১১; অর্থাৎ সরিষার খৈলের পরিমাণ লাগবে ১১/(৫ + ১১)× ১০০ = ৬৮.৭৫%
গমের ভূষি মেশাতে হবে = ৩০-২৫ = ৫; অর্থাৎ গমের ভূষির পরিমাণ লাগবে ৫/(৫ + ১১) × ১০০ = ৩১.২৫%

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরিষার খৈল ও গমের ভূষি মিলে ১০০ কেজি খাদ্য তৈরি করতে হলে সরিষার খৈল মিশাতে হবে ৬৮.৭৫ কেজি এবং গমের ভূষি মিশাতে হবে ৩১.২৫ কেজি। দুই উপকরণ মিলে হবে ৬৮.৭৫ + ৩১.২৫ = ১০০ কেজি। এখন দেখতে হবে এই দুই উপকরণ দিয়ে তৈরি খাবারে আমিষের পরিমাণের যোগফল ২৫% হয় কিনা।

১০০ কেজি সরিষার খৈল থেকে পাওয়া যায় = ৩০ কেজি আমিষ
অতএব ৬৮.৭৫ কেজি সরিষার খৈল থেকে পাওয়া যায় = ২০.৬৩ কেজি আমিষ

আবার, ১০০ কেজি গমের ভূষি থেকে পাওয়া যায় = ১৪ কেজি আমিষ
অতএব ৩১.২৫ কেজি গমের ভূষি থেকে পাওয়া যায় = ৪.৩৭ কেজি আমিষ

অতএব, দুই উপকরণ থেকে পাই ২০.৬৩ + ৪.৩৭ = ২৫ কেজি বা শতকরা হার হবে ২৫%

<u>সমস্যা নং- ২</u>

মনে করি, একজন মৎস্য চাষি/মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী ফিশ মিল, সরিষার খৈল ও গমের ভূষি সহযোগে একটি খাদ্য তৈরি করতে চায় যার আমিষের হার হবে ২৫%। তাহলে তাকে কোন উপকরণ কত অনুপাতে মিশাতে হবে। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুনঃ

ফিশ মিল-আমিষ ৬০%
সরিষার খৈল-আমিষ ৩০%
গমের ভূষি-আমিষ ১৪%

এ ক্ষেত্রে তাকে একটি খাদ্য উপকরণ ফিক্সড করে নিতে হবে। অর্থ্যাৎ যেটিতে আমিষের শতকরা হার সবচেয়ে বেশি এবং বাজার দরও বেশি সেরকম একটি উপকরণকে নির্দিষ্ট হারে (১০-২০%) প্রথমেই যোগ করে নিতে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা ফিশ মিলকে ফিক্সড করে নিতে চাই। অর্থ্যাৎ প্রথমেই ১০% ফিশ মিল নিয়ে নিলাম। তাহলে ১০% হিসেবে এক কেজি খাদ্য তৈরিতে ফিশ মিল প্রয়োজন হবে ১০০ গ্রাম, অর্থ্যাৎ ১০০০ গ্রাম খাদ্য তৈরিতে ফিশ মিলের আমিষ পাব = ৬০ গ্রাম বা ১০০ গ্রাম খাদ্য তৈরিতে ফিশ মিলের (১০% হিসেবে ১০ গ্রাম ফিশ মিল হতে) আমিষ পাব ৬ গ্রাম। তাহলে আমাদের আরও ২৫-৬ = ১৯ গ্রাম আমিষ প্রয়োজন হবে। যা আমরা সরিষার খৈল এবং গমের ভূষি থেকে পাব। কিন্তু আমরা ১০ গ্রাম ফিশ মিল পূর্বেই নিয়ে নেয়ায় খাদ্য উপকরণ বাকি থাকবে ৯০ গ্রাম।

অর্থ্যাৎ ৯০ গ্রাম খাদ্য উপকরণ থেকে পেতে হবে ১৯ গ্রাম আমিষ
বা, ১০০ গ্রাম খাদ্য উপকরণ থেকে পেতে হবে ২১.১১ গ্রাম আমিষ

সুতরাং স্কয়ারের মাঝখানে বসবে ২১.১১ (১৯ বসানো যাবেনা, কেননা ১৯ বসালে দুই উপকরণের প্রতিনিধিত্ব ১০০ ভাগ হবে না)

সরিষার খৈল মেশাতে হবে = ১৪-২১.১১ = ৭.১১, ৭.১১/১৬×১০০×০.৯ = ৪০
গমের ভূষি মেশাতে হবে = ৩০-২১.১১ = ৮.৮৯, ৮.৮৯/১৬×১০০×০.৯ = ৫০

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ফিশ মিল, সরিষার খৈল ও গমের ভূষি মিলে ১০০০ গ্রাম বা এক কেজি খাদ্য তৈরি করতে হলে ফিশ মিল মিশাতে হবে ১০ × ১০ = ১০০ গ্রাম, সরিষার খৈল মিশাতে হবে ৪০ × ১০ = ৪০০ গ্রাম এবং গমের ভূষি মিশাতে হবে ৫০ × ১০ = ৫০০ গ্রাম। তিন উপকরণ মিলে হলো ১০০ + ৪০০ + ৫০০ = ১০০০ গ্রাম বা এক কেজি। এখন দেখতে হবে এই তিনটি উপকরণ থেকে প্রাপ্ত আমিষের পরিমাণের যোগফল ২৫% হয় কিনা।

১০০ গ্রাম ফিশ মিল থেকে আমিষ পাওয়া যায় = ৬০ গ্রাম

১০০ গ্রাম সরিষার খৈল থেকে পাওয়া যায় = ৩০ গ্রাম আমিষ
৪০০ গ্রাম সরিষার খৈল থেকে পাওয়া যায় = ১২০ গ্রাম আমিষ

আবার, ১০০ গ্রাম গমের ভূষি থেকে পাওয়া যায় = ১৪ গ্রাম আমিষ
৫০০ গ্রাম গমের ভূষি থেকে পাওয়া যায় = ৭০ গ্রাম আমিষ

অতএব, তিন উপকরণ থেকে পাই = ৬০ + ১২০ + ৭০ = ২৫০ গ্রাম আমিষ, যা ১০০০ গ্রাম খাদ্যে থাকেবে, অতএব, শতকরা হার হবে ২৫%

সমস্যা নং- ৩

মনে করি, একজন মৎস্য চাষি/মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী ফিশ মিল, সরিষার খৈল ও গমের ভূষি ও অটোকুড়া সহযোগে একটি খাদ্য তৈরি করতে চায় যার আমিষের হার হবে ৩০%। তাহলে তাকে কোন উপাদান কত অনুপাতে মিশাতে হবে। নিচের চিত্র টি ফলো করি

১. সয়াবিন কেক – আমিষ ৪০%
২. সরিষার খৈল – আমিষ ৩০%
৩. গমের ভূষি – আমিষ ১৪%
৪. অটোকুড়া – আমিষ ১২%

এ ক্ষেত্রে তাকে খাদ্য উপকরণগুলোকে ০২ টি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট ও বেসাল ইনগ্রেডিয়েন্ট। যে সব খাদ্য উপকরণের আমিষের পরিমাণ শতকরা ২০% ভাগের নিচে তাদেরকে বলা হয় বেসাল ইনগ্রেডিয়েন্ট এবং যেসব খাদ্য উপকরণের আমিষের পরিমাণ শতকরা ২০% ভাগের উপরে তাদেরকে বলা হয় প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট। পিয়ারসন্স স্কয়ারে যেহেতু দুটি উপাদানের বেশি ইনগ্রেডিয়েন্ট দেখানো যায়না সেহেতু, এখানে বেসাল ইনগ্রেডিয়েন্ট দুটির আমিষের গড় মান নিতে হবে এবং প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট দুটির গড় মান নিতে হবে। পরবর্তীতে ফলাফল সমান হারে ভাগ করে দিতে হবে।

গমের ভূষি ও অটোকুড়ার আমিষের শতকরা হারের গড় মান = (১৪ + ১২)/২ = ১৩
সয়াবিন কেক ও সরিষার খৈলের আমিষের শতকরা হারের গড় মান = (৪০ + ৩০)/২ = ৩৫

সয়াবিন কেক + সরিষার খৈল মেশাতে হবে = ১৩-৩০ = ১৭, ১৭/২২ × ১০০ = ৭৭.২৭
গমের ভূষি + অটোকুড়া মেশাতে হবে = ৩৫-৩০ = ৫, ৫/২২ × ১০০ = ২২.৭৩

অতএব, সয়াবিন কেক মেশাতে হবে ৭৭.২৭/২ = ৩৮.৬৩৫ গ্রাম
সরিষার খৈল মেশাতে হবে ৭৭.২৭/২ = ৩৮.৬৩৫ গ্রাম
অটোকুড়া মেশাতে হবে ২২.৭৩/২ = ১১.৩৬৫ গ্রাম
গমের ভূষি মেশাতে হবে ২২.৭৩/২ = ১১.৩৬৫ গ্রাম

চারটি উপকরণ মিলে মোট ১০০ গ্রাম। যদি এক কেজি খাদ্য তৈরি করা হয় তাহলে প্রতিটি মানকে ১০ দ্বারা গুণ করতে হবে। এখন দেখতে হবে এই ৪ টি উপকরণের আমিষের অবদানের যোগফল ৩০% আমিষ হয় কিনা।

ধরি, এক কেজি খাদ্য তৈরি করতে হবে-অর্থ্যাৎ ১০০০ গ্রাম খাদ্য উপকরণ প্রয়োজনঃ

অতএব, ৩৮৬.৩৫ গ্রাম সয়াবিন কেক থেকে পাব = ১৫৪.৫৪ গ্রাম আমিষ
৩৮৬.৩৫ গ্রাম সরিষার খৈল থেকে পাব = ১১৫.৯০৫ গ্রাম আমিষ
১১৩.৬৫ গ্রাম অটোকুড়া থেকে পাব = ১৫.৯১১ গ্রাম আমিষ
১১৩.৬৫ গ্রাম গমের ভূষি থেকে পাব = ১৩.৬৩৮ গ্রাম আমিষ

চারটি উপকরণ আমিষের অবদানের যোগফল দাঁড়ায় = ২৯৯.৯৯ বা ৩০০ গ্রাম/১০০০ গ্রাম খাদ্য উপকরণ অর্থ্যাৎ ৩০%

সমস্যা নং- ৪

মনে করি, একজন মৎস্য চাষি/মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী ফিশ মিল, সয়াবিন কেক, সরিষার খৈল ও গমের ভূষি ও অটোকুড়া সহযোগে একটি খাদ্য তৈরি করতে চায় যার আমিষের হার হবে ৩০%। তাহলে তাকে কোন উপকরণ কত অনুপাতে মিশাতে হবে। নিচের চিত্র টি ফলো করুন

১. ফিশ মিল – আমিষ ৬০%
২. সয়াবিন কেক – আমিষ ৪০%
৩. সরিষার খৈল – আমিষ ৩০%
৪. গমের ভূষি – আমিষ ১৪%
৫. অটোকুড়া – আমিষ ১২%

এ ক্ষেত্রে তাকে প্রথমে যে খাদ্য উপাদানটির আমিষের হার বচেয়ে বেশি এবং বাজার দরও বেশি সেটি পূর্বেই নির্দিষ্ট মাত্রায় (১০-২০%) যোগ করে নিতে হবে। অবশিষ্ট খাদ্য উপকরণগুলোকে ০২ টি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট ও বেসাল ইনগ্রেডিয়েন্ট। এরপর প্রত্যেক উপকরণের অবদানের অনুপাতের সমান হারে প্রাপ্ত ফলাফল ভাগ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে, তিনটি উপকরণ ও চারটি উপকরণ দিয়ে তৈরি খাদ্যের উভয় নিয়মাবলী ফলো করতে হবে।

সমাধানঃ প্রথমেই ১০% ফিশ মিল নিয়ে নিলাম। তাহলে ১০% হিসেবে এক কেজি খাদ্য তৈরিতে ফিশ মিল প্রয়োজন হবে ১০০ গ্রাম, অর্থ্যাৎ ১০০০ গ্রাম খাদ্য তৈরিতে ফিশ মিলের আমিষ পাব = ৬০ গ্রাম বা ১০০ গ্রাম খাদ্য তৈরিতে ফিশ মিলের (১০% হিসেবে ১০ গ্রাম ফিশ মিল হতে) আমিষ পাব ৬ গ্রাম। তাহলে আমাদের আরও ৩০ – ৬ = ২৪ গ্রাম আমিষ প্রয়োজন হবে। যা আমরা সয়াবিন কেক, সরিষার খৈল এবং গমের ভূষি ও অটোকুড়া থেকে পাব। কিন্তু আমরা ১০ গ্রাম ফিশ মিল পূর্বেই নিয়ে নেয়ায় খাদ্য উপকরণ বাকি থাকবে ৯০ গ্রাম।

অর্থ্যাৎ ৯০ গ্রাম খাদ্য উপকরণ থেকে পেতে হবে ২৪ গ্রাম আমিষ
বা, ১০০ গ্রাম খাদ্য উপকরণথেকে পেতে হবে ২৬.৬৭

সুতরাং স্কয়ারের মাঝখানে বসবে ২৬.৬৭ (২৪ বসানো যাবেনা, কেননা ২৪ বসালে দুই উপকরণের প্রতিনিধিত্ব ১০০ ভাগ হবেনা)

গমের ভূষি ও অটোকুড়ার আমিষের শতকরা হারের গড় মান = (১৪ + ১২)/২ = ১৩
সয়াবিন কেক ও সরিষার খৈলের আমিষের শতকরা হারের গড় মান = (৪০ + ৩০)/২ = ৩৫

সয়াবিন কেক + সরিষার খৈল মেশাতে হবে = ১৩ -২৬.৬৭ = ১৩.৬৭, ১৩.৬৭/২২ × ১০০ × ৯০ = ৫৫.৯২ গ্রাম
গমের ভূষি + অটোকুড়া মেশাতে হবে = ৩৫-২৬.৬৭ = ৮.৩৩, ৮.৩৩/২২ × ১০০ × ৯০ = ৩৪.০৮ গ্রাম

অতএব, সয়াবিন কেক মেশাতে হবে ৫৫.৯২/২ = ২৭.৯৬ গ্রাম
সয়াবিন কেক মেশাতে হবে ৫৫.৯২/২ = ২৭.৯৬ গ্রাম

অটোকুড়া মেশাতে হবে ৩৪.০৮/২ = ১৭.০৪ গ্রাম
গমের ভূষি মেশাতে হবে ৩৪.০৮/২ = ১৭.০৪ গ্রাম

পাঁচটি উপকরণ মিলে মোট ১০০ গ্রাম। যদি এক কেজি খাদ্য তৈরি করা হয় তাহলে প্রতিটি মানকে ১০ দ্বারা গুণ করতে হবে। এখন দেখতে হবে এই ৫ টি উপকরণের আমিষের অবদানের যোগফল ৩০% আমিষ হয় কিনা।

ধরি, এক কেজি খাদ্য তৈরী করতে হবে -অর্থ্যাৎ ১০০০ গ্রাম খাদ্য উপকরণ প্রয়োজনঃ

অতএব, ১০০ গ্রাম ফিশ মিল থেকে পাব = ৬০ গ্রাম আমিষ
২৭৯.৬ গ্রাম সয়াবিন কেক থেকে পাব = ১১১.৮৪ গ্রাম আমিষ
২৭৯.৬ গ্রাম সরিষার খৈল থেকে পাব = ৮৩.৮৮ গ্রাম আমিষ
১৭০.০৪ গ্রাম অটোকুড়া থেকে পাব = ২০.৪ গ্রাম আমিষ
১৭০.০৪ গ্রাম গমের ভূষি থেকে পাব = ২৩.৮ গ্রাম আমিষ

পাঁচটি উপকরণের আমিষের অবদানের যোগফল দাঁড়ায় = ২৯৯.৯ বা ৩০০ গ্রাম/১০০০ গ্রাম খাদ্য উপাদান অর্থ্যাৎ ৩০%

সমস্যা নং- ৫
মনে করি, একজন মৎস্য চাষি/মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী সরিষার খৈল এবং অটোকুড়া সহযোগে একটি খাদ্য তৈরি করতে চায় যার আমিষের হার হবে ৩০%। সাথে সে বাইন্ডার হিসেবে ৫১ আটা ও %% খনিজ লবণ মেশাতে চায়। তাহলে তাকে কোন উপকরণ কত অনুপাতে মেশাতে হবে। নিচের চিত্র টি ফলো (অনুসরণ) করুনঃ

সরিষার খৈল-আমিষ ৩৪%
অটো কুড়া-আমিষ ১২%

এ ক্ষেত্রে প্রথমে ৫% আটা এবং ১% খনিজ লবণের পরিমাণ ০৬ গ্রামকে মোট ওজন ১০০ গ্রাম থেকে বাদ দিয়ে নিতে হবে। অর্থ্যাৎ আমরা সরিষার খৈল ও অটোকুড়া থেকে সর্বোচ্চ ১০০-৬ = ৯৪ গ্রাম খাদ্য উপকরণ নিতে পারব। এখানে আটা থেকে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ১ গ্রাম আমিষের পরিমাণকে উপেক্ষা করা যায়, আবার হিসাবে গণ্য করাও যায়। উপেক্ষা করলে হিসাব এক রকম হবে আর হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করলে ফলাফল হবে অন্য রকম। প্রথমে আটার আমিষের পরিমাণ উপেক্ষা করে হিসাব বের করা যাক-

অর্থ্যাৎ ৯৪ গ্রাম খাদ্য উপকরণ থেকে পেতে হবে ৩০ গ্রাম আমিষ
বা, ১০০ গ্রাম খাদ্য উপকরণ থেকে পেতে হবে ৩০ গ্রাম আমিষ

সরিষার খৈল মেশাতে হবে = ১২-৩০ = ১৯.৯, ১৯.৯/(২২) × ১০০ × ০.৯৪=৮৫.০ গ্রাম
অটোকুড়া মেশাতে হবে = ৩৪-৩১.৯ = ২.১, ২.১/(২২) × ১০০× .৯৪ = ০৯.০ গ্রাম

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরিষার খৈল ও অটোকুড়া মিলে ১০০০ গ্রাম/এক কেজি খাদ্য তৈরি করতে হলে সরিষার খৈল মিশাতে হবে ৮৫ **X** ১০ = ৮৫০ গ্রাম এবং অটোকুড়া মেশাতে হবে ৯ **X** ১০ = ৯০ গ্রাম। দুই উপকরণ মিলে হলো ৯৪০ গ্রাম এবং আটা ও খনিজ পদার্থ মিলে হবে ৬০ গ্রাম সব মিলে হবে ১০০০ গ্রাম/এক কেজি। এখন দেখতে হবে এই দুই উপকরণ থেকে প্রাপ্ত আমিষের পরিমাণের যোগফল ৩০% হয় কিনা।

১০০ গ্রাম সরিষার খৈল থেকে পাওয়া যায় = ৩৪ গ্রাম আমিষ
৮৫০ গ্রাম সরিষার খৈল থেকে পাওয়া যায় = ২৮৯ গ্রাম আমিষ

আবার, ১০০ গ্রাম গমের ভূষি থেকে পাওয়া যায় = ১২ গ্রাম আমিষ
৯০ গ্রাম অটোকুড়া থেকে পাওয়া যায় = ১০.৮ গ্রাম আমিষ

অতএব, দুই উপকরণ থেকে পাই ২৮৯ + ১০.৮ = ২৯৯.৮ গ্রাম আমিষ/১০০০ গ্রাম খাদ্য, অতএব, শতকরা হার হবে ৩০%

এভাবে পিয়ারসন্স স্কয়ারের মাধ্যমে যেকোন সংখ্যক উপকরণ মিশিয়ে মাছের সুষম খাদ্য তৈরি করা সম্ভব।

আটার আমিষ, হিসাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে ৯ গ্রাম আমিষ (৫০ গ্রাম আটা থেকে প্রাপ্ত) পূর্বে প্রাপ্তি দেখাতে হবে। অর্থ্যাৎ ৯৪ গ্রাম খাদ্য উপকরণ থেকে আমাদের ৩০-৯ = ২১ গ্রাম আমিষ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাইন্ডার হিসেবে আটার ব্যবহারই লাভজনক। এক্ষেত্রে ভালো বাইন্ডারও পাওয়া গেলো, আমিষও মিলল।

২. খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি ও খাদ্য প্রয়োগ হার

২.১ মৎস্য খাদ্য তৈরীর স্থান (কারখানা) নির্বাচন ও নকশা প্রণয়ন (Site selection and design of factory)

মৎস্যখাদ্য তৈরীর অবস্থান ও নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাটির অবস্থা ও পরিবহন সুবিধাদিসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হবেঃ

- কারখানা স্থাপনের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে মাটির অবস্থা ভাল এবং বন্যা ও জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত হওয়ার সম্বাবনা নেই।
- কারখানার অবস্থান এমন স্থানে হতে হবে যেখানে কারখানা উদ্ভুত আদ্রতার প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে এবং কারখানা প্রাঙ্গন ও আশপাশ এলাকায় প্রচুর ঝোপঝাড় জন্মাতে না পারে।
- কারখানার কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের সহজ ও সাশ্রয়ী পরিবহনের সুবিধার্থে কারখানার জন্য নির্বাচিত স্থান সড়ক ও রেলওয়ে পরিবহন অবকাঠামোর সন্নিকটে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- কারখানার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত যেখানে ভবিষ্যতে স্বল্পব্যয়ে কারখানা সম্প্রসারণ করা যায়। কারখানা স্থাপনের শুরুতেই যন্ত্রপাতির আকার ও ডিজাইন এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে অধিকতর উন্নত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হলে সহজেই তা প্রতিস্থাপন করা যায়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ডিজাইন পরিবর্তনযোগ্য হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- কারখানার ডিজাইনে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। ভবনাদির ডিজাইন এমন হতে হবে যাতে অনিষ্টকর জীবজন্তু যথা- ইঁদুর, বেজি, শিয়াল ও পাখি প্রবেশ এবং বাসা বেঁধে থাকতে না পারে।
- ভবনাদির ডিজাইন প্রণয়ন, নির্মাণ ও নির্মাণ সামগ্রী নির্বাচনকালে সহজে পরিষ্কার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপরিষ্কারযোগ্য দুর্গম ও নিভৃত স্থান পরিহার ইত্যাতি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।
- স্থাপনার বাহ্যিক গঠন ও বিন্যাস এমন ভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কারখানার নিঃসৃত বা মিল এলাকার নির্গত পানি ধারণ বা সুষ্ঠু নিষ্কাশন সম্ভব হয়।
- কারখানার ডিজাইন আধুনিক, দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশ বান্ধব হতে হবে।
- কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে এলাকার জনগোষ্ঠীর সাথে অবিরোধপূর্ণ, ইতিবাচক শক্তি ও সুবাণিজ্যিক প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

২.২ মৎস্য খাদ্য তৈরি করার জন্য মান সম্পন্ন উপকরণ একান্ত প্রয়োজন এজন্য নিম্নে উল্লেখিত বিয়াবলী অনুসরণ করতে হবেঃ

২.২.১ খাদ্য উপকরণ নির্বাচন, ক্রয় ও মাননিয়ন্ত্রণ

- তৈরি খাদ্যের মান ব্যবহৃত উপকরণের মানের ওপর নির্ভরশীল। তাই খাদ্য উৎপাদকের দায়িত্ব হলো উৎপাদনে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। মানসম্মত উপকরণ ক্রয়ের জন্য প্রত্যেক খাদ্য উৎপাদকের কতগুলি নির্ধারিত ষ্ট্যান্ডার্ড থাকতে হবে।
- একই সরবরাহকারীর সরবরাহকৃত উপকরণের মান যদি একেক ব্যাচে একেক রকম বা একেক মাসে একেক রকম হয়, সে ক্ষেত্রে তার মাত্রা নিরূপণ ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- উপকরণের মান নির্ধারিত ষ্ট্যান্ডার্ড পূরণ করছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পুষ্টিবিদ কিংবা মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাকে সময়ে সময়ে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে উপকরণের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
- সংগৃহিত উপকরণ পরিদর্শন করে লেবেলিং করতে হবে।
- মান পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, কোন উপকরণের মান কারখানার নির্ধারিত মান পূরণে ব্যর্থ হলে এবং সরবরাহকারী অনবরত নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ অব্যাহত রাখলে ঐ সরবরাহকারীর তালিকাভূক্তি বাতিল করতে হবে।
- বাতিলকৃত সরবরাহকারী পুনর্বহালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত ইতিবাচক ব্যবস্থাদির যথাযথ প্রমাণ প্রদর্শন করতে হবে।
- কারখানার উপকরণের নির্ধারিত ষ্ট্যান্ডার্ড বাৎসরিক বা প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যালোচনা করে পুষ্টি গাইডলাইনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। উৎপাদন ম্যানেজার ক্রয় ম্যানেজারের সহায়তায় ষ্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করবেন।
- ছত্রাকযুক্ত, রংযুক্ত বা বিবর্ণ উপকরণ খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে না। কীটনাশক বা পোকামাকড়নাশক রাসায়নিক দ্রবাদি প্রয়োগকৃত উপকরণ জলজ প্রাণী ও মানুষের জন্য খুবই বিষাক্ত। ছত্রাকযুক্ত উপকরণে মাইকোটক্সিন নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয় যার সামান্য উপস্থিতিও (পিপিবি মাত্রা) চাষাধীন প্রজাতির জন্য খুবই ক্ষতিকর।
- তাছাড়া কোন উপকরণে কীটনাশক বা পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশের স্বল্পমাত্রার উপস্থিতিও চাষাধীন প্রজাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

- খাদ্য তৈরীর সকল স্থাপনা ও সুবিধাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি শর্তাবলি মেনে চলতে হবে এবং এর মূল্যায়নের জন্য একটি চেকলিস্ট থাকতে হবে।
- উৎপাদিত খাদ্যের যথাযথ মান বজায় রাখার জন্য উৎপাদকের প্রয়োজনীয় মজুদ সুবিধা থাকতে হবে যাতে পোকামাকড়, পাখি এবং পরিবেশগত কারণে খাদ্যের সজীবতা ও মান নষ্ট না হয়।
- উপকরণ সরবরাহকারীকে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে, সরবরাহকৃত উপকরণ খাদ্যে ব্যবহারের সম্পূর্ণ উপযোগী, এতে কোনরূপ ভেজাল নেই ও এর মান সরকারি বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- পরিবহন সংস্থাকে এই মর্মে সনদ প্রদান করতে হবে যে, উপকরণ পরিবহন যান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জলজ প্রাণী ও মানুষের জন্য ঝুঁকিমুক্ত।
- সরবরাহকারীকে প্রয়োজনে সময়ে সময়ে উপকরণের মান পরীক্ষা করতে হবে এবং চালানের সাথে মান পরীক্ষার রিপোর্ট দাখিল করতে হবে
- নতুন সরবরাহকারী নিকট থেকে উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর বিদ্যমান সুবিধাদি, উপকরণের মান, উপকরণ পরীক্ষার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও ফলাফল সংক্রান্ত প্রতিবেদন, সরবরাহকারীর লিখিত মান নিশ্চয়তা কর্মসূচি, সরবরাহকারীর নির্ভরযোগ্যতা, উপকরণের মজুদ, নমুনা সংগ্রহ ও মান পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করতে হবে।
- উৎপাদন প্রক্রিয়ার মান এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন উৎপাদিত খাদ্য কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির জন্য যথাযথ মানের হয়। খাদ্য উৎপাদনে ষ্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা অনুসরণে করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য উৎপাদনের বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। এই রেকর্ডের মাধ্যমে পণ্য চিহ্নিত করাও সম্ভব হবে।

২.২.২ উপকরণ গ্রহণ (Receiving ingredient)

- খাদ্য উপকরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উপকরণের লেবেলিং, ক্রয়ের স্পেসিফিকেশন, পরিবহন যানের গন্তব্য, লট নম্বর তারিখ, নিয়ন্ত্রণ বিধির শর্তাদি পূরণ ইত্যাদি সকল বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করে দেখতে হবে
- গ্রহণ ও খালাসের পূর্বে উপকরণের বর্ণ, গন্ধ, ভেজাল দ্রব্যের উপস্থিতি, কীট-পতঙ্গের উপস্থিতি, দানার অবস্থা বা গঠন, আর্দ্রতা, ওজন ও সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি-বিধানে আরোপিত শর্তাদি পূরণ করা হয়েছে কিনা, ক্রয়কালীন পরিদর্শনে তা যাচাই করতে হবে
- জানা উপকরণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবলোকনের মাধ্যমে মান তুলনা করে দেখতে হবে। উপকরণভর্তি বস্তা পরিদর্শন করে ছিড়া বা ফাটা বস্তা গণনা করে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।
- বস্তাভর্তি উপকরণ খালাসের পূর্বে অথবা খালাসের সময় (প্রিমিক্স, ঔষধপত্র, ইত্যাদি) এর সংখ্যা গুণে চালানের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত বস্তা পাওয়া গেলে বাদ দিতে হবে।
- মান পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে
- সময়ে সময়ে সকল উপকরণের পুষ্টিমান (আদ্রতা, প্রোটিন, স্নেহ, আঁশ, ছাই, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লবণ) পরীক্ষা করে ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। তাছাড়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রোগজীবাণু এবং ক্ষতিকারক অ্যান্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপস্থিতি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- খালাসের পূর্বে অথবা প্রাক্কালে যদি দেখা যায় যে, কোন উপকরণ ক্রয় আদেশের নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন পূরণে ব্যর্থ হয়েছে সেক্ষেত্রে উহা গ্রহণ করা যাবে না
- উপকরণ গ্রহণকালে উপকরণের নাম, গ্রহণের তারিখ, পরিবহনকারীর নাম, বস্তার সংখ্যা, সাইজ, লট নম্বর, মান সম্পর্কিত মন্তব্য গ্রহণকারীর স্বাক্ষরসহ সংরক্ষণ করতে হবে
- বস্তাবন্দি বা খোলা উপকরণ যেটাই হোক, 'আগের উপকরণ আগে ব্যবহার' অর্থাৎ 'ফাষ্ট-ইন, ফাষ্ট-আউট' পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে
- উপকরণ রাখার সকল পাত্র বা তাক প্রতিদিন চেক করে সাজানো ঠিক আছে কিনা চেক করে দেখতে হবে
- উপকরণ খালাস এলাকা বিশেষ করে খোলা উপকরণ খালাস এলাকা দৈনিকভিত্তিতে পরিদর্শন করে নিয়মিত পরিষ্কার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
- উপকরণের গমনাগমন পথ মিল ম্যানেজার কর্তৃক সতর্কতার সাথে তৈরি করতে হবে এবং খালাসের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা কর্তৃক দ্বিতীয় চেক সম্পাদন করতে হবে। উপকরণের ক্রস কন্টামিনেশন যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২.২.৩ উপকরণের চুড়ান্ত সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং (Storage and handling of ingredient)

- প্রক্রিয়াজাতকরণের পূর্বে যে সকল উপকরণ শুকনা অবস্থায় থাকে সেগুলো শুকনা ও ঠান্ডা অবস্থায় সংরক্ষিত রাখতে হবে। সাধারণভাবে আদ্র ও উষ্ণ অঞ্চলে উপকরণের আদ্রতা ১২% এর নীচে হবে।
- ধুলিকণার সৃষ্টি এবং উপকরণের গুড়া হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করার জন্য যে ট্যাংক বা ধারকে উপকরণ রাখা হয় তা মাসে একবার বা প্রয়োজনমত পরিষ্কার করতে হবে। কারণ, এরূপ পরিবেশে ছত্রাক (মাইকোটক্সিনের উৎস) ও কীট জন্মায়। ফলে সংরক্ষিত পণ্যের খাদ্যমান দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে ধুলিকণামুক্ত রাখার জন্য লিফট, পরিবাহক যন্ত্র ও নল নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিষ্কার করতে হবে। এতে তৈরি পণ্যে দূষণের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।
- তরল উপকরণ যথা- টেলো (তৈল জাতীয় পদার্থ), মোলাসেস, ইত্যাদি এর সজীবতা ও গুণগতমান বজায় রাখার জন্য উৎপাদকের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ ও সংরক্ষণ করতে হবে
- স্নেহ ও তৈলজাতীয় উপকরণ হ্যান্ডলিং এর সুবিধার্থে তাপ প্রদান বা খারাপ গন্ধ প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে
- মৎস্যখাদ্য সাধারণত কতিপয় পঁচনশীল ও দামী উপকরণসহযোগে তৈরি করা হয়। এ কারণে উপকরণ ও তৈরি খাদ্য উভয়ই যাতে তাপ, আলো ও রোগজীবাণু বহনকারী কীট-পতঙ্গ/প্রাণী যথা- মাছি, পিঁপড়া, তেলাপোকা, ইঁদুর, ছুচো, পাখি ইত্যাদি দ্বারা দূষিত বা সংক্রমিত হতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। উপকরণ ও খাদ্য সরাসরি সূর্যের আলো, তাপের সংস্পর্শে রাখা যাবে না। আদ্রতার ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখার জন্য খাদ্যভর্তি ব্যাগ ষ্টোরের মেঝের কিছুটা উপরে মাচায় রাখতে হবে।
- মান ও ধরণের ভিত্তিতে উপকরণ পরিষ্কার করার দরকার হতে পারে। একারণে খাদ্য তৈরির স্থানে ভাঙ্গা শস্যকণা, ভারীধাতু ও অন্যান্য অনাকাংক্ষিত বস্তু অপসারণ করার জন্য উপকরণ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- উপকরণ রাখার পাত্র, সাইলো, গুদামঘর ও উপকরণ হ্যান্ডলিং সিষ্টেম এমনভাবে নির্মিত হতে হবে যাতে কীট-পতঙ্গ, পোকামাকড়, পাখি ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে। তৈরি পণ্যের উচ্চমান বজায় রাখার জন্য মজুদ এলাকা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। উপকরণ আগমন ও গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়সূচি থাকতে হবে।
- নিম্নমান বা নষ্ট বা ফেরত আসা খাদ্য এমনভাবে মজুদ করতে হবে যেন অন্যান্য খাদ্য উপকরণ দূষিত না হয়। এরূপ খাদ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার ক্ষেত্রে মান নিশ্চিতকরণ পরীক্ষার মাধ্যমে উপযোগীতা নির্ণয় করতে হবে অথবা অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুসরণযোগ্য রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৩ খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি

সূত্র অনুযায়ী পরিমাণমত উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য উপাদান প্রয়োজনে গ্রাইন্ডারে বা আটা পেষা মেশিনে বা ঢেঁকিতে ভাল করে চূর্ণ বা গুঁড়া করে নিতে হবে এবং চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। এরপর ফুরমূলা অনুযায়ী উপাদানসমূহ একটি একটি করে নির্দিষ্ট মাত্রায় মেপে নিতে হবে এবং অল্প অল্প করে মিক্সার মেশিনে বা বড় একটি পাত্রে ঢেলে হাত কিংবা লাঠি দিয়ে শুকনা অবস্থায় ভালভাবে মিশাতে হবে। উত্তমরূপে মিশানোর পর অল্প অল্প করে পানি এমনভাবে মিশিয়ে নাড়তে হবে যাতে সমস্ত মিশ্রণটি একটি আঠালো পেষ্ট বা মন্ডে পরিণত হয়। হাইন্ডার হিসাবে চিটাগুড় ব্যবহার করলে চিটাগুড়কে প্রথমে পানিতে মিশিয়ে পাতলা করে উপরোক্ত নিয়মে পেষ্ট বা মন্ড তৈরী করতে হয়। এই পেষ্ট বা মন্ড ভেজা খাদ্য হিসাবে সরাসরি মাছকে দেয়া যেতে পারে অথবা পিলেট বা বড়ি আকারে দানাদার খাদ্য তৈরী করে শুকিয়ে রাখা যায়। পিলেট বা বড়ির আকার চাষকৃত মাছের মুখের আকার অনুযায়ী তৈরী করতে হবে যাতে মাছ এই খাবার মুখে নিয়ে খেতে পারে। নির্দিষ্ট আকারের চালনী ব্যবহার করে এটা করা যায়। হস্তচালিত সেমাই মেশিনের মত লোহা দিয়ে কম খরচে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মেশিন তৈরী করে হাতে চালিয়েও পিলেট/বড়ি তৈরী করা যেতে পারে। এছাড়াও পিলেট/বড়ি তৈরীর জন্য বড় আকারের (বাণিজ্যিক) পিলেট মেশিন রয়েছে, যেখানে মিশ্রিত করণ ও পিলেট তৈরী দুটোই করা যায়।

পিলেটের স্থায়িত্ব বাড়ানোর উপায়

- প্রথমে মিশ্রনীয় খাদ্য উপাদানগুলো ভালভাবে গুড়া করতে হবে।
- খাদ্য উপাদানগুলো ভালভাবে মিশ্রিত করতে হবে
- খাদ্য উপাদানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ (১০-১৫ গ্রাম) আঠালো দ্রব্য বা বাইন্ডিং এজেন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- খাদ্য উপাদানগুলোকে ভালভাবে (২০-৩০ মিনিট) নাড়াচাড়া করে তারপর পিলেট বানাতে হবে
- পিলেট মেশিনে মসৃন ছাঁকনি ব্যবহার করতে হবে।

চিত্রঃ স্থানীয় ছোট পিলেট মেশিনে তৈরি পিলেট রোদ্রে শুকানো হচ্ছে

সাবধানতা

পিলেট তেরীর সময় প্রয়োজনীয় পরিমান পানির চেয়ে যদি কম পরিমাণ পানি নেওয়া হয় তবে পিলেটের গা মসৃন হবে না, ফলে পিলেটের স্থায়িত্ব কম হবে। কিমা কিংবা সেমাই বানানোর মেশিনের সাহায্যে ভাল দানাদার খাদ্য তৈরী করা যায়। তৈরীকৃত খাদ্য রোদে শুকালে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায়।

২.৩.১ মৎস্য খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত কার্য অনুসরণ করতে হয়

(১) খাদ্য উপকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing of feed ingredient)

- উপকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে এক বা একাধিক খাদ্য উপকরণের মিশ্রণে খাদ্য তৈরির যান্ত্রিক পদ্ধতিকে বুঝায়। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উপকরণের বাহ্যিক ও পুষ্টিগুণ পরিবর্তন করে ধারাবাহিকভাবে মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরি করা হয়। প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রধান প্রধান প্রসেসগুলো হলোঃ ব্যাচকরণ, মিশ্রণ, কনার আকার হ্রাসকরণ, কন্ডিশনিং, পিন্ডীকরণ, পিলেট পরবর্তী কন্ডিশনিং, চর্বি দ্বারা আস্তরণ, শুষ্ককরণ, ঠান্ডাকরণ, পিলেট বা ছোট দানাকরণ এবং বস্তাজাতকরণ।
- খাদ্য উপকরণে কোন লৌহ খন্ড বা ধাতব পদার্থ থাকলে পৃথকীকরণের জন্য সকল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় প্রয়োজনীয় সুবিধাদি থাকতে হবে।
- কারখানায় ঔষধমিশ্রিত খাদ্য (Medicated feed) উৎপাদনকালে এগলোকে শ্রেণীভূক্ত করতে হবে। যদি শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে প্রসেসিং সিস্টেমে কর্নমিল বা অনুরূপ উপকরণ প্রবাহিত করে ফ্লাশ করতে হবে এবং ইহা একই ঐষধমিশ্রিত খাদ্যেও সাথে রাখতে হবে।
- সকল খাদ্য মিল পরিচালনাকারীকে যন্ত্রপাতির মৌলিক পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে যথা- কনা ছোটকরণ ম্যানুয়েল, পিলেট মিল পরিচালনা ম্যানুয়েল, এক্সট্রুসন পরিচালনা ম্যানুয়েল ও অন্যান্য মিল যন্ত্রপাতি পরিচালনা ম্যানুয়েল সম্পর্কে জানতে হবে।
- মেশিন চালানোর পূর্বে মেশিনের হ্যামার, রোলার ইত্যাদি চেক করে পণ্য গন্তব্যস্থলে প্রবাহিত হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- পিলেট তৈরি করা হলে পানিতে এর স্থায়ীত্ব কাল পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- বাষ্প দ্বারা যথাযথ কন্ডিশনিং করা হলে খাদ্যে শ্বেতসারের কাঠিন্যতা, পানিতে স্থিতিশীলতা ও পরিপাক বৃদ্ধি পায়।
- ভাসমান বা ফাপা খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে খাদ্যের আকৃতি, উপকরণের ঘনত্ব, ভাসমানতা, ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(২) খাদ্য ফর্মুলা নির্ধারণ ও খাদ্য তৈরি (Feed formulation and manufacturing)

- নির্দিষ্ট প্রজাতি ও চাষ পদ্ধতির ভিত্তিতে দক্ষ পুষ্টিবিদের সুপারিশকৃত ফর্মুলা অনুসারে খাদ্য তৈরি করতে হবে।
- স্বাদুপানির প্রজাতির খাদ্য তৈরিতে প্রোটিন ও শক্তির জন্য উদ্ভিদজাত উপাদান ব্যবহার করা হয় এবং সামুদ্রিক শীতল প্রাণীর খাদ্য তৈরিতে প্রধানত ফিশমিল ও অন্যান্য মৎস্য উপজাত দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। তবে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য স্বল্পব্যায়ী উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি করাই ভাল। উপকরণের দানার আকার খাদ্যকলের যন্ত্রের আকারের উপর নির্ভর করে। মৎস্যখাদ্যে দানার আকার প্রধানত ছোট হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ভাল মিশ্রণের জন্য এর আকার ৫০ মাইক্রনও হতে পারে।
- উপকরণসমূহ হ্যামার মিল, রোলার মিল বা অন্যভাবে গুড়া করে ফর্মুলা অনুযায়ী সমভাবে মিশিয়ে পিলেট মিলের সাহায্যে পিলেট তৈরি করে যথাযথভাবে ঠান্ডা ও শুষ্ককরণের পর ব্যাগে ভর্তি করতে হয়।

- পানিতে স্থিতিশীল ও সহজ প্রাচ্য পিলেট বা ভাসমান খাদ্য তৈরি করার জন্য ভালভাবে কুকিং এর মাধ্যমে মন্ড তৈরি করতে হবে। অন্যথায়, খাদ্য পানিতে গুলে গিয়ে খামারে দূষণ ঘটায়।
- ডুবন্ত পিলেট খাদ্যের তুলনায় ভাসমান পিলেট ব্যয় সাশ্রয়ী হয়।

(৩) ফর্মুলাভিত্তিক খাদ্য তৈরি (Formula based feed preparation)

- কারখানার পুষ্টিবিদ খাদ্য তৈরির জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির পুষ্টি চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্য ফর্মুলা নির্ধারণ করবেন। উৎপাদন ম্যানেজার পুষ্টিবিদের ফর্মুলা অনুযায়ী খাদ্য তৈরি নিশ্চিত করবেন।
- কারখানা প্রত্যেক উপকরণের সঠিক পুষ্টিমান ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি করবেন
- যেহেতু অনেক চাষকৃত মাছের পুষ্টি চাহিদা এখনো নির্ধারিত হচ্ছে, সেজন্য উৎপাদক ও পুষ্টিবিদকে চলমান মৎস্যপুষ্টি গবেষণা বিষয়ে ওয়াকেবহাল থাকতে হবে।
- খাদ্যে কোন ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। খাদ্যে কোন ঔষধ ব্যবহৃত হলে ব্যাগের উপর তার নাম ও খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কিত নির্দেশনা থাকতে হবে।
- সকল ঔষধমিশ্রিত খাদ্য অন্যান্য উপকরণ ও খাদ্য হতে পৃথকভাবে মজুদ করতে হবে। খাদ্য মজুদ এলাকায় শুধুমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক ছাড়া অন্যদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- প্যাকেটের গায়ে সকল খাদ্য ফর্মুলার শনাক্তকরণ নম্বর, খাদ্যের ধরন, যে প্রজাতির জন্য খাদ্য তৈরি করা হয়েছে তার নাম, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, ওজন, ব্যবহৃত উপকরণের নাম ও ব্যবহারের মাত্রা এবং ব্যবহৃত ঔষধের নাম (ব্যবহৃত হয়ে থাকলে) লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- বালিত বা অকার্যকর ফর্মুলা সর্বশেষ ব্যবহারের পর ন্যূনতম এক বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৪ মাছের বয়স ভিত্তিক খাদ্যের শ্রেণি বিভাগ

(১) নার্সারী খাদ্য ঃ রেনু বা লার্ভার এন্ডোজেনাস ইয়োগস্যাক এর খাদ্য প্রায় বা সম্পূর্ন নিঃশেষিত হলে যে খাদ্য প্রয়োগকরা হয়, তাই নার্সারী খাদ্য। নার্সারী খাদ্যে অবশ্যই সকল সকল পুষ্টিমান সম্পূর্নভাবে থাকতে হবে। এটা সহজপাচ্য এবং সূক্ষ পাউডার আকারের হতে হবে।

(২) স্টার্টার খাদ্য ঃ মাছ ও চিংড়ির আনমেটাফরফোসড কিশোরপূর্ব পর্যায়ে স্টার্টার খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। এটা উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ, চুর্ন দানাদার আকারের হবে। মাছের প্রজাতি ও আকারের উপর ভিত্তি করে স্টার্টার-১, স্টার্টার-২ ও স্টার্টার-৩ এই তিন ক্যাটাগরীর স্টার্টার খাদ্য উৎপাদিত ও প্রয়োগ করা হয়।

(৩) গ্রোয়ার খাদ্য ঃ কিশোর মাছ ও চিংড়িকে যে খাদ্য প্রয়োগ করা হয় সেটাই গ্রোয়ার খাদ্য। গ্রোয়ার খাদ্য নার্সারী খাদ্য বা স্টার্টার খাদ্যের চেয়ে কম প্রোটিন সমৃদ্ধ হয়। এটা পিলেট আকারের হয় এবং আকৃতিতে ২-৫ মি.মি।

(৪) ফিনিশার খাদ্য ঃ প্রাপ্তবয়স্ক মাছ ও চিংড়িকে যে খাদ্য প্রয়োগ করা হয় তাই ফিনিশার খাদ্য। সাধারনত উচ্চ মূল্যের মাছ ও চিংড়ির ক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য আহরনের পূবে প্রয়োগ করা হয়। গ্রোয়ার খাদ্য ও ফিনিশার খাদ্য প্রায় একই।

২.৫ সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগের হার

মাছ চাষের ক্ষেত্রে মৎস্য খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মাছের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন আকারের খাদ্য যেমন দিতে হয় ঠিক তেমনই প্রতিদিন কি পরিমাণে খাবার দিতে হবে তার ও ভিন্নতা আছে। সকল প্রাণির মত ছোট আকারের বা পোনা মাছের খাবার সাধারণত তুলনামূলক পরিমানে বেশি এবং বেশি পুষ্টিমানের খাবার দিতে হয়।

(১) নার্সারি পুকুরে রেনু/ধানী পোনার ক্ষেত্রে

নার্সারি পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের হার পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুনাবলী ছাড়াও পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, চাষ ব্যবস্থাপনা খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। ছোট অবস্থায় পোনার খাদ্য চাহিদা অনেক বেশি। সেজন্য নার্সারি পুকুরে প্রথম দিকে বেশি মাত্রায় খাবার প্রয়োগ করতে হয়। তবে পোনা বড় হওয়ার সাথে সাথে খাদ্য প্রয়োগের হার কমে গেলেও খাদ্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়।

(২) আঁতুড় পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ হার ঃ

খাদ্য প্রয়োগকাল (দিন)	খাদ্য প্রয়োগহার
১-৫	প্রতিদিন মজুদকৃত পোনার ওজনের ২ গুন
৬-১০	প্রতিদিন মজুদকৃত পোনার ওজনের ৩ গুন
১১-১৫	প্রতিদিন মজুদকৃত পোনার ওজনের ৪ গুন

লালন পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ হার ঃ মজুদকৃত পোনার ওজনের ১০-৫% অথবা

খাদ্য প্রয়োগকাল (দিন)	খাদ্য প্রয়োগহার
১-১০	প্রতিদিন ৪০-৪৫ গ্রাম/শতাংশ
১১-২০	প্রতিদিন ৮০-১০০ গ্রাম/শতাংশ
২১-৩৫	প্রতিদিন ২০০ গ্রাম/শতাংশ

(৩) প্রতিপালন পুকুরের ক্ষেত্রে

নার্সারি পুকুরের মত প্রতিপালন পুকুরের ক্ষেত্রেও খাদ্য প্রয়োগের হার পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুনাবলি ছাড়াও পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, চাষ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের অবস্থা ও পুষ্টিমান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে মাছের দেহের ওজনের ৫%-৩% পর্যন্ত খাদ্য প্রয়োগ করা হয় অথবা মাছ যতটুকু খেতে পারে ততটুকুই দিতে হবে।

ভাসমান খাদ্যের বেলায় খাদ্য প্রয়োগের ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে এবং ডুবন্ত খাদ্যের বেলায় খাদ্য প্রয়োগের ৩০-৪০ মিনিটের মধ্যে যতটুকু খাবে ততটুকুই মাছের চাহিদা হিসেবে ধরা হবে।

মাছের খাদ্য চাহিদা পুকুরের পানির যে সকল ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ঃ

- মাছের খাদ্য চাহিদা পানির পিএইচ এর উপর উঠানামা করে
- পিএইচ মাত্রা ৭.০-৮.০ এর মধ্যে মাছের খাদ্য চাহিদা বেশী থাকে
- পানিতে দ্রবীভুত অক্সিজেনের মাত্রা বাড়লে খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়
- পানিতে দ্রবীভুত অক্সিজেনের মাত্রা কমলে খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়

২.৬ উত্তম মৎস্যখাদ্য উৎপাদন অনুশীলন (জিএমপি) এর লক্ষ্য

জিএমপির মূল লক্ষ্য হলো- নিরবচ্ছিন্নভাবে ভালমানের মৎস্যখাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং এলক্ষ্যে খাদ্য কারখানার মালিক ও কর্মীদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা। এ দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ ঃ

- মৎস্যচাষী বা ক্রেতার জন্য মানসম্মত মৎস্যখাদ্য তৈরি ও সরবরাহের জন্য উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে
- উৎপাদনকারীকে এরূপ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যাতে সকল কর্মচারী উৎপাদিত খাদ্যের গুণগতমান রক্ষা করার বিষয়টিকে তাদের সরাসরি দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে এবং কার্যকরভাবে গুড প্রাকটিস অনুসরণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমানভাবে দায়ী থাকে
- মানুষ ও জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে খাদ্য উৎপাদনে শুধুমাত্র উপযুক্ত মানের উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। নিম্নমানের, পঁচা কিংবা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা দূষিত উপকরণ কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।
- কর্তৃপক্ষকে নতুন ও পুরাতন কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে তাঁরা দক্ষতার সাথে উৎপাদনের সকল কাজ পরিচালনা করতে পারে এবং কোন সমস্যা দেখা দিলে এমনভাবে সমাধান করতে পারে যা পূর্বাপর উচ্চমানের খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে
- যে প্রজাতি এবং ফার্মিং সিস্টেমের জন্য খাদ্য তৈরি করা হয়েছে মোড়কের উপর তার ব্যবহার বিধি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রচারপত্রের মাধ্যমে চাষীকে তা অবহিত করতে হবে যাতে চাষীরা খাদ্য হ্যান্ডলিং ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন
- খাদ্য উৎপাদনকারীকে তার ক্রেতা ও কর্মচারীদের জিএমপি সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি আন্তরিক থাকতে হবে, খাদ্যের অব্যাহত মানোন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে, এবং পরিবেশগত বিরুপ প্রভাবও ন্যুনতম পর্যায়ে রাখতে হবে
- খাদ্য উৎপাদনকারীকে যতটা সম্ভব শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নয়, চাষ পদ্ধতি উন্নয়নের জন্যও চাষীর সাথে একত্রে কাজ করতে হবে যাতে পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ন্যুনতম পর্যায়ে রাখা যায়।

৩. মাছের ভাল খাদ্যের গুণাগুণ

(১) উন্নত কাঁচামাল ঃ চালের কুড়া, গমের ভূষি, আটা, ময়দা, ভূট্টা, শুটকি মাছ, ফিশমিল, মিট এন্ড বোল মিল, সয়াবিন খৈল, সরিষার খৈল, বাদামের খৈল, তিলের খৈল, সূর্যমূখীর খৈল, লাইম স্টোন, খাবার লবণ, মাছের তৈল, মোলাসেস প্রভৃতি কাঁচামাল আদর্শ মানের হতে হবে।

(২) সঠিক খাদ্যমান নিশ্চিতকরণ ঃ নির্দিষ্ট প্রজাতি ও জীবনচক্রের ধাপ অনুযায়ী পুষ্টিমান নিশ্চিত করহে হবে।

(৩) নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি নিশ্চিতকরণ ঃ ছোট পোনা মাছের খাবার এবং ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম বা ১ কেজি ওজনের মাছের খাবারের আকৃতি এক হবে না। কোনটা পাউডারের মত, কোনোটা দানাদার অথবা কোনটা বিভিন্ন পরিমাপের (যেমন ২.২ মিমি. ২.৫ মিমি. ৩.০ মিমি বা ৪.০ মিমি ব্যাস) হতে পারে। মাছের আকৃতির পাশাপাশি মাছের প্রজাতি যেমন কার্প জাতীয় মাছ, পাঙ্গাস, শিং-মাগুর, তেলাপিয়া প্রভৃতি বিবেচনায় এনে এদের চাহিদা অনুযায়ী খাবার-পুষ্টিমান নির্ধারণ করতে হবে।

(৪) খাবারে সহজপাপ্য উপকরণ নিশ্চিতকরণ ঃ পরিপাকযোগ্য খাবার সরবরাহ করতে হবে। কাঁচা নাড়ি-ভূড়ি না দিয়ে সিদ্ধ নাড়ি-ভূড়ি সরবরাহ করা উচিত।

(৫) খাবারে পুষ্টি বিরোধী উপাদান কম থাকা ঃ সয়াবিন মিল ও সরিষার খৈলে প্রোটিয়েজ নিরোধক ট্রিপসিন থাকে। সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতিকালে সংশ্লিষ্ট খাদ্য দ্রব্যকে আধা সিদ্ধ বা তাপ প্রয়োগ করলে পুষ্টিবিরোধী দ্রব্যের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

(৬) প্রাণিজ আমিষ ব্যবহার ঃ মাছের খাবারে প্রাণিজ আমিষের গুরুত্ব অনেক বেশি। খাবারে মোট আমিষের ৬০% বা তার বেশি প্রাণিজ আমিষ থাকা ভাল। মাছের খাবারে শুটকি মাছ উত্তম কাঁচামাল এবং এতে খাদ্য রুপান্তর াহার ভাল হয়।

(৭) খাবারের আনুষঙ্গিক উপকরণ ঃ উত্তম কাঁচামাল ছাড়াও আদর্শ বা মানসম্মত মাছের খাবার তৈরীতে আরো আনুষাঙ্গিক কিছু উপাদান প্রয়োজন রয়েছে যেগুলো খাবারের কার্যকারিতা বাড়ায় এগুলোর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ খনিজ লবণ, এনজাইম, মাছের তেল প্রভৃতি। মানসম্মত এসব মাইক্রো ইনগ্রেডিয়েন্টস খাবারের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণে মিশ্রণ করলে খাবারের গুনাগুন নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়।

(৮) পানিতে খাবারের স্থায়িত্ব ঃ সুষম হলেও সম্পূরক খাবার পানিতে প্রয়োগের পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবিকৃত থাকা আবশ্যক। তা না হলে খাবারের সাথে পানিতে গলে বা পানিতে মিশে গেলে পানির গুনাগুন যেমন নষ্ট হবে তেমনি সে খাবার মাছ গ্রহণ করতে না পারলে খাবারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হবে না। এ কারণে তৈরী খাবার পানিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবিকৃত রাখতে খাবারের সাথে বাইন্ডার ব্যবহার করা যায়। এ বাইন্ডারের কোনো পুষ্টিমান না থাকলেও খাবারের স্থায়িত্বকাল বাড়াতে ব্যবহার করতে হবে বিশেষত চিংড়ি খাবারে এটা অধিক প্রয়োজন।

(৯) খাবারের প্রতি মাছের আকর্ষণ ঃ সাধারণত খাবারের উপকরণ, গন্ধ এবং আকারের প্রতি মাছ আকৃষ্ট হয়। মাছের খাবারে প্রয়োজনমত শুঁটকি মাছ এবং মাছের তেল ব্যবহার করলে মাছ দ্রুত আকৃষ্ট হয়। এতে খাবারের অপচয় কম হয় এবং মাছের বৃদ্ধি বেশি হয়।

(১০)খাদ্য রুপান্তর হার নিশ্চিতকরণ ঃ নিরাপদ খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করার পর তা যদি প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরবরাহ করা হয় তা হলে মাছের বৃদ্ধি আশানুরুপ হবে এবং পুকুরে পানির গুনাগুনও রক্ষিত হবে।

৪. খাদ্য প্রয়োগের বিবেচ্য বিষয় ও খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

৪.১ সম্পুরক খাদ্য

প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাহির থেকে সরবরাহকৃত মাছ কর্তৃক সরাসরি ব্যবহৃত খাদ্য হচ্ছে সম্পুরক খাদ্য। প্রয়োগকৃত খাদ্যের ২৫% দেহ বৃদ্ধিতে, ৫০% বিপাকীয় ক্রিয়ায় ব্যয় হয় এবং বাকী ২৫% মল মূত্রের সাথে বের হয়ে যায়।

৪.২ খাদ্য নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়াদি

মাছ ও চিংড়ির অধিক উৎপাদন করাই হচ্ছে সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য। সে কারনে পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য নির্বাচনে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত কারন সঠিক খাদ্য নির্বাচন করতে না পারলে একদিকে মাছের উৎপাদন ব্যাহত হবে অন্যদিকে পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পড়বে। নিচে লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য খাদ্য নির্বাচনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো-

- উপাদানসমূহের সহজলভ্যতা
- চাষীর আর্থিক সঙ্গতি
- উপাদানসমূহের মূল্য
- মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা
- মাছ ও চিংড়ির পছন্দ
- উচ্চ খাদ্য পরিবর্তন হার

৪.৩ খাদ্য প্রয়োগের বিবেচ্য বিষয়

এাছ চাষে সফল হওয়ার জন্য প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে করতে হয়। বিশেষ করে পুকুরে সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগের সময় অত্যন্ত সজাগ থাকতে হয়। খাবারের প্রতি মাছের আগ্রহ বা সাড়া (Response against feed), মাছের খাদ্য গ্রহণের সময় কাল। খাবার গ্রয়োগের পর কত দ্রুত খাবার গ্রহণ করছে তা পর্যবেক্ষণ করা। মাছ স্বাভাবিক সুস্থ থাকলে প্রদত্ত খাবার দ্রুত খেয়ে ফেলে। খাবারের প্রতি মাছের স্বাভাবিক সাড়া প্রদান না করলে মাছ রোগ গ্রস্থ হয়েছে বলে বা পুকুরে অন্য কোন সমস্যার কারণে মাছ পিড়ন অবস্থায় পড়েছে বলে মনে করা হয়। এসব বিষয় ছাড়াও অন্য যে সকল বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

- খাবার সরাসরি রোদে শুকালে খাদ্যের গুনগত মান নষ্ট হয়, তাই পলিথিন দ্বারা ঢেকে শুকালে খাদ্যের গুনগত মান ভাল থাকে।
- সরিষার খৈল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে খৈলের ক্ষতিকর আলফাটক্সিন মুক্ত হবে।
- মাছের মুখের আকার দেখে খাদ্যের আকার ঠিক করতে হবে।
- সমান ভাগ করে কয়েকটি স্থানে বাঁশ বা খুঁটি দিয়ে চিহ্নিত করে প্রতিদিন একই সময়ে ঐ স্থানে সম্ভব হলে খাদ্যদানীতে খাদ্য দেওয়া উচিত।
- পোনা মাছচাষের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ১ বার এবং বড় মাছচাষের ক্ষেত্রে ১৫ দিনে/মাসে ১ বার নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে খাবারের পরিমান ঠিক করতে হবে।
- শীতকালে খাদ্য প্রয়োগের হার স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বা তিনভাগের একভাগ কমিয়ে আনতে হবে। প্রচন্ড শীতের সময় তাপমাত্রা বেশী কমে যায় বলে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হয়।
- গ্রীষ্মকালে যখন পুকুরে পানি কমে তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং পুকুরে শ্যাওলার স্তর পড়লে খাবার প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে বা বন্ধ রাখতে হবে।
- খাদ্য প্রয়োগের আধা ঘন্টা পর পর্যবেক্ষণ করতে হবে। খাবার থেকে গেলে বুঝতে হবে খাদ্যের পরিমাণ বেশি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ঠ না থাকলে আস্তে আস্তে প্রয়োগমাত্রা বাড়াতে হবে।
- পানিতে শ্যাওলার পরিমাণ বেড়ে গেলে (Phytoplanctonic bloom) খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে বা বন্ধ রাখতে হবে। শ্যাওলা দমন করে খাদ্য প্রয়োগ আরম্ভ করতে হবে বা প্রয়োগ হার বাড়াতে হবে।
- প্রতিদিন একই সময়ে একই স্থানে খাদ্য দেওয়া উচিত।
- একসাথে বেশি খাবার না দিয়ে অল্প অল্প করে দেওয়া উত্তম।
- মাছ কে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকা, পরিমিত হলে ভালো তবে খাদ্য অতিক্তির থেকে অপর্যাপ্ত হলে ক্ষতি কম হবে।
- বৃষ্টির দিনে, মেঘলা দিনে এবং পানিতে প্রাকৃতিক খাবারের আধিক্য দেখা দিলে (অতিরিক্ত সবুজ) সাময়িক খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
- শীতকালে খাদ্য স্বাভাবিক মাত্রার ৫০% কম প্রয়োগ করতে হবে।
- তরুণ (Juvenile) মাছের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া যাতে তার পুষ্টির ঘাটতি না থাকে।
- ছোট মাছের ক্ষেত্রে দিনে ৩ বা ৪ বার এবং বড় মাছের ক্ষেত্রে দিনে ২ বারের বেশি খাবার না দেওয়া ভাল।
- তলদেশে বসবাসকারী মাছদের আকৃষ্ট করার জন্য খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

- প্যাকেটজাত খাবারের ক্ষেত্রে প্যাকেটের গায়ে লেখা মেয়াদ দেখে খাবার ব্যবহার করতে হবে।
- মৎস্য খামারের দায়িত্বশীল ব্যাক্তি কোন কারণে ছুটিতে থাশলে সেদিনের খাদ্য প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা অর্থাৎ মাছ যেন না খেয়ে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা।
- ভাল মানের খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত।
- মাছকে তাজা শাকসব্জি মাসে ২/১ বার প্রয়োগ করা ভালো।

৪.৪ সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

নার্সারি পুকুরে রেনু/ধানী পোনার ক্ষেত্রে

রেনু মজুদের প্রথম ৫ দিন পর্যন্ত সরিষার খৈল ভিজিয়ে রেখে গুলিয়ে প্রয়োগ করা ভাল। তারপর তার সাথে মিহি চালের কুঁড়া/ভূষির মিশ্রন দেওয়া যায় (৫০ঃ৫০)। ধানী পোনা কাটাই করার পর চারা পুকুরে সম্পুরক খাদ্য হিসেবে সাধারনত কুঁড়া/গমের ভুষি ও খৈল ব্যবহার করা যায়। অধিক উৎপাদনের জন্য এর সাথে আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য (গবাদি পশুর রক্ত/ফিশ মিল) দেওয়া যেতে পারে। খাদ্যে আমিষের মান ২৫-৩০% হলে ভাল হয় এবং প্রতিদিন পোনাকে তাদের দেহ ওজনের ৫-১০% খাদ্য দেওয়া উচিত। রক্ত/ফিসমিল ব্যয়বহুল এবং এগুলো সহজপ্রাপ্য না হলে শুধু খৈল ও কুঁড়া (৫০ঃ৫০) ব্যবহার করা যেতে পারে।

খৈল ও কুঁড়া ভিজিয়ে কাই করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দেওয়া ভাল। প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান ভাগ করে দিনে ৩ থেকে ৪ বার সরাসরি পুকুরে ছিটিয়ে দেওয়া ভাল।

প্রতিপালন পুকুরের ক্ষেত্রে ঃ

১. সরাসরি ছিটিয়ে- ভাসমান খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাছচাষের পুকুরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান ২ ভাগ করে একভাগ সকাল ১০-১১ টার মধ্যে এবং অপর ভাগ বিকেল ৩-৪ টার মধ্যে সরাসরি পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে খাদ্যের অপচয় কম হয় এবং বাইরে থেকে বোঝা যায় মাছ কতটুকু খাবার খেতে পারে। কিন্তু জলাশয়ের তলদেশে বসবাসকারী মাছের ক্ষেত্রে ভাসমান খাদ্য ব্যবহারের সমস্যা হলো তাদের কাছে খাবার সহজে পৌছায় না বা পৌছানোর আগেই গলে যায়। অর্থাৎ তারা ঠিকমত পুষ্টি পায় না।

   ডুবন্ত খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মাছচাষের পুকুরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান ২ ভাগ করে একভাগ সকাল ১০-১১ টার মধ্যে এবং অপর ভাগ বিকেল ৩-৪ টার মধ্যে সরাসরি পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে সুবিধা হলো খাদ্য খুব দ্রুত মাছের কাছে পৌছে যায় ফলে খাদ্য গলে যাওয়ার আগেই মাছ খেতে পারে এবং খাবারের প্রতিযোগীতা কম হয়।

   অসুবিধা হলো বাইরে থেকে বোঝা যায় না মাছ কতটুকু খাবার খেতে পারছে ফলে খাদ্যের কিছুটা অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অনেক সময় খাদ্যে আদ্রতার পরিমান বেশী থাকলে মাছ খাওয়ার আগেই গলে যায় এবং খাদ্যের অপচয় হয়। অপচয় হওয়া খাদ্য পুকুরের পানির পরিবেশ নষ্ট করে থাকে। পানিতে ক্ষতিকর গ্যাসের সুষ্টি করতে পারে। এ পদ্ধতিতে খাদ্য প্রদানে অধিক সময় লাগে এবং শ্রমিক বেশি লাগে।

চিত্র ঃ সরাসরি ছিটিয়ে খাদ্য দেওয়া

(২) খাদ্যদানীতে খাদ্য প্রয়োগ ঃ ডুবন্ত খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে খাদ্যের অপচয় রোধ ও পরিবেশ ভাল রাখার জন্য খাদ্যদানীতে খাদ্য প্রয়োগ করাই উত্তম। ডুবন্ত খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাছচাষের পুকুরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান ২ ভাগ করে একভাগ সকাল ১০-১১ টার মধ্যে এবং অপর ভাগ বিকেল ৩-৪ টার মধ্যে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। কার্পজাতীয় মাছকে খাদ্য দেওয়ার সময় এটি পানির উপরিতল থেকে ৩০ সে.মি নিচে এবং পাংগাস মাছকে খাদ্য দেওয়ার সময় এটি পানির মধ্যস্তরে স্থাপন করা উচিত। উল্লেখ্য যে, চিংড়ির জন্য খাদ্য দেওয়ার সময় পুকুরের তলদেশ থেকে ১ ফুট উপরে খাদ্যদানী স্থাপন করতে হবে।

চিত্র ঃ ফিডিং ট্রে-তে খাদ্য দেওয়া

- খাদ্যদানী তৈরী

  এটির আকার সাধারণত ১ বর্গমিটার হলে ভাল হয়। বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমের নিচে মশারির কাপড় লাগিয়ে ধর্মজালের মতো করে এটি তৈরী করা হয়। ফ্রেমটির উচ্চতা ১০ সে.মি. রাখা উচিত। ৩০ শতাংশ পুকুরে ২ টি, ৬০ শতাংশ পুকুরে ৪ টি এবং ১০০ শতাংশ পুকুরে ৬টি খাদ্যদানী স্থাপন করলেই চলে। এটি নিয়মিত পরিস্কার রাখা উচিত। মাছের মুখ যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য খাদ্যদানীতে প্লাস্টিক বা টিনের পাত্র ব্যবহার করাই উত্তম।

  এ পদ্ধতির সুবিধা হলো মাছে কি পরিমাণে খাবার খেয়েছে তা সহজে জানা যায় এবং খাদ্যের অপচয় রোধ করা যায়। তবে খাদ্য গ্রহণে মাছ প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হয়।

  কোন কারনে খাদ্যদানী ব্যবহার করা সম্ভব না হলে প্রতিদিন পুকুরের তলায় কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় খাবার প্রয়োগ করতে হবে। অপর দিকে গলদা চিংড়ি নিশাচর। দিনের আলোর চেয়ে এরা অন্ধকারে চলাচল ও খাদ্য গ্রহন করতে পছন্দ করে। সেজন্য কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান ২ ভাগ করে একভাগ সকাল ৬ টার আগে এবং আরেকভাগ সন্ধ্যা ৬ টার পরে প্রয়োগ করতে হয়। সকালের খাবারকে আবার ২ ভাগ করে অর্ধেক খাদ্যদানীতে এবং বাকী অর্ধেক পুকুরের কয়েকটি জায়গা কাঠি দ্বারা চিহ্নিত করে সেখানে দিতে হবে।

(৩) স্বয়ংক্রিয় খাদ্য প্রদান যন্ত্র (Automatic Fish Feeder)

প্রতিদিন নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার প্রয়োগের কথা থাকলেও চাষিরা উপযুক্ত সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় অনুমান করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে খাবার প্রয়োগ করে থাকেন। এছাড়াও শ্রমিকেরা তাদের পরিশ্রম কমানোর জন্য অনেক সময় এক জায়গায় খাবার প্রয়োগ করে থাকে। ফলে কখনও খাবারের স্বল্পতা আবার কখনও অধিক খাবার প্রয়োগের কারণে তা নষ্ট হয়ে পুকুরের পানি দূষিত করে এবং বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাসের সৃষ্টি হয়। যার প্রভাবে মাছের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে এবং মাছের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ব্যাহত হয়। অটোমেটিক ফিস ফিডার (Automatic Fish Feeder) ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যায়। অটোমেটিক ফিস ফিডার একটি প্রোগ্রামকৃত যন্ত্র,যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ খাবার সুষম দূরত্বে সমহারে পুকুরে প্রয়োগ করা যায়। এতে সকল মাছের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় এবং শ্রমিক নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। অটোমেটিক ফিস ফিডার ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের খাবারের অপচয়, শ্রমিক ব্যয় এবং মানবসৃষ্ট অন্য কোনো অসততা থেকে সহজেইমুক্ত থাকা সম্ভব। তবে এ প্রযুক্তি যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল প্রয়োজন।বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামও ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশেঅটোমেটিক ফিস ফিডার মৎস্য

খামারগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যবহার সীমিত আকারে শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের শেরপুর, ময়মনসিংহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাগেরহাট, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ফেনী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার,মাদারীপুর, যশোর, খুলনা,চট্টগ্রাম, বগুড়া, নাটোরসহ বিভিন্ন জেলার মাছ চাষিরা এই মেশিন ব্যবহার করছে।বিভিন্ন মৎস্য খামারে এ অটোমেটিক ফিস ফিডার স্থাপন করেচাষিরা একদিকে যেমন মাছের খাদ্য প্রয়োগের হার কমাতে সক্ষম হয়েছেন, অন্যদিকে খামারে সঠিক পরিমাণে মাছের খাবারব্যবহারের মাধ্যমে দূষণের পরিমাণহ্রাসের ফলে পুকুরের পরিবেশের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে অতিনিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত অটোমটিক ফিডারও উন্নত বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেখানে সাইলো থেকে বাতাসের চাপে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিমান খাদ্য পানিতে ছড়িয়ে পড়বে। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরএএস (Recirculatory aquaculture system) পদ্ধতির মাছ চাষে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তেলাপিয়া বা অন্য কোন প্রজাতির হ্যাচারিতেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ১: অটোমেটিক ফিস ফিডার
(বাংলাদেশী প্রযুক্তি)

চিত্র ২: অটোমেটিক ফিস ফিডার
(ইন্দোনেশিয়ান প্রযুক্তি)

চিত্র ৩: অটোমেটিক ফিস ফিডার
(চাইনিজ প্রযুক্তি)

অটোমেটিক ফিসফিডার ব্যবহারের সুবিধা

- এ যন্ত্রটি ২-১৮ মিটার দূরত্বে ১৩০°পর্যন্ত খাবার ছড়িয়ে দিতে সক্ষম;
- যন্ত্রটি প্রয়োজনীয় বিরতিতে ও সমহারে খাবার প্রয়োগ করে, ফলে সকল মাছ সমানভাবে খেতে পারে ও তাদের মধ্যে খাবার গ্রহণের প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং মাছের আকারের তারতম্য (size variation) কম হয়;
- খাবারের অপচয় দূর করে এবং শ্রমিক নির্ভরতা কমায়;
- অতিরিক্ত খাবারপানিতে পঁচে নষ্ট হয় না ফলে পুকুরের পানি দূষণ মুক্ত থাকে;
- পুকুরের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকায় মাছ ও চিংড়ি রোগ হতে মুক্ত থাকে এবং
- অধিক ঘনত্বে মাছচাষ ও মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

৩. খাদ্যের কার্যকারিতা ও খাদ্য রূপান্তর হার (FCR-Feed Conversion Ratio)

৩.১ খাদ্যের কার্যকারিতা (Feed Performance)

তৈরিকৃত খাদ্যের কার্যকারিতা বলতে গ্রহণকৃত খাদ্যের কত অংশ মাংশে রুপান্তর হয়েছে বা খাদ্য মাংশে রুপান্তরের পরিমাণ যে খাদ্যের বেশি সে খাদ্য কার্যকরীতা তত বেশি। বিষয়টি প্রকারন্তরে খাদ্যের এফসিআরকে নির্দেশ করে। এফসিআর অর্থ পুকুরে মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্যের পরিমাণ এবং উক্ত খাদ্য গ্রহণে মাছের যে নিট ওৎন বেড়েছে তার অনুপাত। অর্থাৎ ২ এক কেজি খাবার খেয়ে যদি ১ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়ে থাকে তবে এখানে এফসিআর হবে ২ঃ১। যে খাদ্য যত ভঅল তার এফসিআর এর মান তত কম। যে খাবার যত কার্যকর সে খাদ্য তত ফলপ্রদ যা প্রকৃত পক্ষে এফসিআরের মানের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। আধুনিক মাছ চাষির প্রয়োগকৃত খাদ্যের এফসিআর এর মান ও এফসিআরের মান নির্ণয় পদ্ধতি এবং এতদবিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৩.২ খাদ্য রূপান্তর হার

খাদ্য রূপান্তর হার হলো খাদ্য প্রয়োগ এবং খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত। অর্থাৎ ১ কেজি মাছ পেতে যত কেজি খাবার খাওয়াতে হয়, সেটাই খাদ্য রূপান্তর হার বা এফসিআর।

$$\text{এফসিআর} = \frac{\text{প্রদানকৃত খাদ্য}}{\text{দৈহিক বৃদ্ধি}}$$

দৈহিক বৃদ্ধি = আহরণকালীন মোট ওজন − মজুদকালীন মোট ওজন

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি পুকুরের মজুদকালীন মোট মাছের ওজন ছিল ৫ কেজি। নিয়মিতভাবে খাদ্য প্রয়োগ করার ফলে ৬ মাস পরে আহরণ কালে মোট ৭৫ কেজি মাছ পাওয়া গেল এবং মনে করি এই ৬ মাসে মোট ১০৫ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। এখানে এফসিআর এর মান হলো।

$$\text{এফসিআর} = \frac{১০৫}{৭৫-৫} = ১.৫ঃ১$$

এফসিআর বানিজ্যিক মাছচাষি এবং মৎস্যখাদ্য শিল্পে বহুল ব্যবহৃত একটি পরিমাপক যার ওপর মাছচষে লাভ-ক্ষতি অনেকাংশে নির্ভর করে। বানিজ্যিক চাষি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, মৎস্যখাদ্য সংশ্লিষ্ট সকলের এফসিআর সংক্রান্ত বিশদ ধারণা থাকা আবশ্যক। যে খাদ্যের এফসিআর যত কম, সে খাদ্যের মান তত ভালো এবং সে খাদ্য দ্বারা মাছ চাষে উৎপাদনে খরচ তত কম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কম এফসিআরে এবং কম খরচে মাছ উৎপাদনই মৎস্যচাষিদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সাধারণত কোন মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনায় এফসিআর মান ১.০ থেকে ১.৫ এর মধ্যে থাকলে, তা লাভজনক হবে। এফসিআর ২.০ বা তার বেশি হলে চাষির জন্য মাছে চাষে লাভ করা কঠিন।

এফসিআর নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তাঃ

সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে মৎস্য খাবারের এফসিআর নির্ণয় করা প্রয়োজন

ক) চাষির নিজস্ব তৈরি খাবার বা উদ্যোক্তা তৈরি বা যে কোন ব্র্যাণ্ড কোম্পানির খাবারের কার্যকারিতা জানার জন্য।

খ) সাধারণত প্রতি ১৫ দিন পর পর বা আধুনিক বানিজ্যিক চাষে ৭ দিন পর পর চাষিরা খাদ্য পরিবর্তন করে থাকে। খাদ্য পরিবর্তনের সময় অবশ্যই খাদ্যের এফসিআর নির্ণয় করতে হবে।

গ) মাছচাষে যেহেতু খাদ্য বাবদ বেশির ভাগ খরচ হয়ে থাকে, সেহেতু এফসিআর নির্ণয়ের মাধ্যমে চাষি তার পুকুরে খাদ্য বাবদ খরচ তথা পুকুরের মাছচাষের লাভ ও ক্ষতি হিসাব করতে পারবেন।

খাদ্যের কার্যকারিতা ও এফসিআর এর মানের প্রভাবকসমূহঃ

- **নিম্ন উল্লেখিত কারণে খাদ্যের এফসিআর এর মান প্রভাবিত হয়ঃ**

১। মাছের প্রজাতি ও বয়সঃ কোন কোন মাছ সম্পূরক খাদ্যের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়, আবার কোন কোন মাছে সম্পূরক খাদ্য গ্রহণে অনাগ্রহতা দেখা যায়। যেমন তেলাপিয়া, পাঙ্গাস মাছ যেভাবে কৃত্রিম খাবারে অভ্যস্ত, রুই জাতীয় মাছ সেভাবে অভ্যস্ত না। তাই পাঙ্গাস, তেলাপিয়া মাছের থেকে রুই জাতীয় মাছের খাদ্যের এফসিআর বেশি হবে। আবার একই প্রজাতির পোনা মাছের ক্ষেত্রে খাদ্য অপচয় বেশি হয়। ফলে বড় মাছ থেকে পোনা উৎপাদনে এফসিআর বেশি হবে।

২। খাদ্য উপকরণের গুণাগুণঃ বাজারে বিভন্ন মানের খাদ্য উপকরণ পাওয়া যায়। যেমন এ গ্রেড ফিসমিল, বি গ্রেড ফিসমিল, সি গ্রেড ফিসমিল ইত্যাদি। আবার সরিষার খৈল, অটোকুড়া প্রভৃতি উপাদানেরও গুণাগুণ ও দামের তারতম্য বাজারে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরুপ চালের কুড়া ও তেল নিস্কাষিত চালের কুড়া উল্লেখযোগ্য। যত ভালো মানের উপকরণের সহায়তায় খাদ্য তৈরি করা হবে, খাবারের মান তত বাড়বে; উক্ত খদ্যের এফসিআর তত কমবে। আবার উপকরণ গুদামজাতকরণের অবস্থার ওপর খাদ্যের মান তথা এফসিআর নির্ভর করে। যেমন সরিষার খৈল যদি দীর্ঘ সময় দোকান বা গুদামে সংরক্ষিত থাকে তবে মান কমে যায় এবং তা দ্বারা থেরি খাদ্য মানসম্পন্ন হবে না। আবার বাজারে প্রাপ্ত অনেক খৈল ভাঙা, চূর্ণ, অবস্থায় পাওয়া যায়, যা দিয়ে তৈরি খাদ্য ভালো মানের হবে না এবং খাদ্যের এফসিআর কমে যাবে। তাই উপকরণ সংগ্রহের সময় এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৩। প্রস্তুতকৃত খাবারের আকারঃ চাষকৃত মাছের আকারের সাথে প্রয়োগকৃত খাবারের আকারের সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। পুকুরে ছোট আকারের মাছ থাকলে পাউডার বা ছোট আকারের খাবার দিতে হবে এবং বড় মাছ থাকলে বড় আকারের খাবার দিতে হবে। নতুবা খাদ্য অপচয় হবে এবং এফসিআর ও খাদ্য বাবদ খরচ বেশি হবে।

৪। প্রস্তুতকৃত খাবারের পুষ্টিমানঃ প্রস্তুতকৃত খাবারের পুষ্টিমান বিশেষ করে আমিষের মানের ওপর এফসিআর অনেকাংশে নির্ভর করে। খাদ্যে যদি মাছের উপযুক্ত পরিমান গুণগত আমিষ বিশেষ করে এসেনসিয়াল এমাইনো এসিড সমৃদ্ধ আমিষ থাকে তবে উক্ত খাদ্যের এফসিআর কম হবে। আবার নির্দিষ্ট মাছের নির্দিষ্ট বয়সের জন্য যে পরিমান আমিষ খাদ্যে থাকার কথা, তা যদি না থাকে তবে খাদ্যের এফসিআর বেশি হবে।

৫। পুকুর/জলাশয়ের পানির গুণাগুণ খাদ্যে এফসিআর মানের উপর প্রভাব রাখে

ক) তাপমাত্রাঃ একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে মাছের বিপাকীয় হার বাড়ে এবং মাছের খাদ্য গ্রহণের হারও বাড়বে। সাধারণত প্রতি ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে মাছের খাদ্য গ্রহণের হার দ্বিগুণ হয়। ফলে মাছের বৃদ্ধি বাড়বে এবং এফসিআর কম হবে।

খ) অক্সিজেনঃ বানিজ্যিক মাছচাষে পানিতে অক্সিজেনের পরিমান বৃদ্ধি করতে পারলে মাছের বিপাকীয় হার বাড়বে এবং মাছের খাদ্য গ্রহণের হারও বাড়বে। ফলে মাছের বৃদ্ধি বাড়বে এবং এফসিআর কম হবে। আধুনিক মাছচাষে খামারিরা অধিক পুষ্টিকর খাবার প্রয়োগ করে থাকে যা হজমের জন্য মাছের শরীরে অধিক শক্তি ব্যয় করতে হয়। শক্তি যোগানে রক্ত প্রবাহে অক্সিজেনের মাত্রা একটি নিয়ন্ত্রক উপাদান। পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা ভালো (৫ পিপিএম বা তার ওপরে) থাকলে, মাছের শরীরে খাদ্য আত্মীকরণের হার (Assimilation Rate) বেড়ে যায়। পঞ্চাশ শতক আকারের একটি পুকুরে বাজারে প্রচলিত চার পাখা বিশিষ্ট একটি এরেটর দিনে ২-৩ ঘন্টা ব্যবহার করলে পানি আন্দোলিত হবে, পানির সঞ্চালন হবে, অক্সিজেন যুক্ত হবে, পানির পরিবেশ উন্নত হবে এবং খাদ্যের এফসিআর কম হবে।

গ) ঘোলাত্বঃ পুকুরের পানি যদি অধিক ঘোলা থাকে, তবে মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা কমে যাবে এবং খাদ্যের অপচয় হবে ও এফসিআর ভালো হবে না। সাধারণত বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পানি ঘোলা থাকে এবং এ সময় খাদ্য প্রয়োগ করলে খাদ্য অপচয় বেশি হবে।

৬। পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতাঃ পানিতে যদি চাষকৃত মাছের জন্য উপযুক্ত প্রকৃতিক খাদ্য তৈরি হয় তাহলে সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি কিছু প্রাকৃতিক খাদ্যও মাছ গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে এফসিআর কম হবে। রুই জাতীয় মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরিতে এটি বিবেচনা করা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৭। খাদ্য প্রয়োগে সতর্কতাঃ মাঠ পর্যায়ে অনেক চাষি অধিক লাভের আশায় বা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাদ্য প্রয়োগ করে থাকে। তাদের মধ্যে একটা ধারণা রয়েছে যে, অধিক খাদ্য ব্যবহার করলে, মাছ বেশি খাবে এবং বেশি লাভবান হবে। কিন্তু এতে দেখা যায়, খাদ্যের অপচয় বেশি হয় এবং এফসিআর বেড়ে চাষি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

৮। খাদ্য প্রয়োগের সময় নির্ধারণঃ কিছু কিছু মাছ রাতে ক্ষেতে পছন্দ করে। যেমন শিং, পাবদা মাছ। এসব মাছে দিনের প্রখর রোদে খাদ্য প্রয়োগ করলে, মাছ খাদ্য গ্রহণ করবে না এবং খাদ্যের অপচয় হবে ও এফসিআর বেশি হবে।

৯। প্রোবায়টিকের ব্যবহারঃ মাছের খাদ্য হজমে বা খাদ্য উপাদান সরলীকরণে প্রোবায়টিক বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। যেহেতু প্রবায়টিক পরিবেশ পরিশোধনে এবং পোষকের শরীরে উপকারী অনুজীবের কার্যকরিতা বৃদ্ধি করে ফলে মাছ ভাল পরিবেশ নিশ্চিত করাই মাছকে পিড়ন থেকে রক্ষা করে এবং মাছের খাদ্য ব্যবহারে অধিক পারঙ্গমতা প্রকাশ করে। ফলে প্রয়োগকৃত খাদ্যের এফসিআর এর মানের উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

৩.৩ প্রোবায়োটিক (Probiotics) বলতে যেসব জীবিত অণুজীব পোষকের (মাছ, চিংড়ি, মানুষ ইত্যাদি যে কোন প্রাণী) দেহে ও পরিবেশে উপস্থিত থেকে পোষককে ক্ষতিকর রোগজীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় ও পোষকের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে সেসব উপকারী অণুজীবকেই প্রোবায়োটিক নামে অভিহিত করা হয়। সহজ কথায় প্রোবায়োটিক হলো উপকারী বন্ধু অণুজীব (প্রধানত ব্যাকটেরিয়া জাতীয়) যাদের উপস্থিতিতে জীবদেহে ও পরিবেশের ক্ষতিকর অণুজীব দমন করা যায় এবং তাদের ক্ষতি করার ক্ষমতাও কমানো যায়। ফলে চাষযোগ্য প্রজাতিকে বিভিন্ন রোগব্যাধি হতে বাঁচিয়ে পরিবেশবান্ধব চাষ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং সার্বিক উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়।

- **প্রোবায়োটিকের নিয়মিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা (Importance of regular use of Probiotics)ঃ**

রোগ হওয়ার পর চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ প্রতিরোধ সর্বদাই উত্তম। মাছ ও চিংড়ির অন্ত্রে উপকারি এবং অপকারি এই উভয় প্রকার অনুজীবই বিদ্যমান। সুযোগ সন্ধানী ক্ষতিকর এই অনুজীবগুলো সুযোগ পেলেই মাছ ও চিংড়িতে রোগ তৈরি করে ফলে দৈহিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়, এমনকি মৃত্যুও ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় অপরদিকে প্রোবায়োটিক জীবদেহের বিভিন্ন জৈবিক কাযে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই মাছ ও চিংড়ির অন্ত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপকারি অণুজীব বা প্রোবায়োটিকের সংখ্যা বজায় রাখা খুবই জরুরি। কিন্তু অনেক সময় নানা কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক কারনে যেমন- অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ বা এর বাহ্যিক ব্যবহার নানাবিধ পীড়ন ও ধকল, বাসস্থান ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে উপকারি অণুজীবের সংখ্যা কমে যেতে পারে। পরিবেশে উপকারি এবং অপকারি অণুজীবের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলেই পরিবেশ দূষিত হয়, উপকারি অণুজীবের অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট হয়, চাষযোগ্য প্রজাতিতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ: আরো নানা সমস্যা তৈরি হতে থাকে। তাই কেবল দূষিত পরিবেশে বা রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য নয় বরং সুস্থ ও স্বাভাবিক সময়কালেও মাছ ও চিংড়ির - নিয়মিত প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত।

১০। মাছের খাদ্য এবং এ্যরেটরের ভূমিকা ঃ বর্তমান সময় আধুনিক প্রযুক্তির জয়জয়কার। মাছ চাষের পুকুরে এ্যারেটর সংযোজন করতে পারলে নিরাপদ মাছ চাষে কয়েকধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়। মাছ চাপষের পুকুরের দ্রবণীয় অক্সিজেনেরে (Dissolve Oxygen) অভাব একটি সাধারণ সমস্যা। যান্ত্রিক এ্যারেটর এসমস্যা দূর করা ছাড়াও পুকুরের সাধারণ অক্সিজেনের মাত্রা (৫ পিপিএম) বাড়িয়ে দেয় ফলে মাছের খাদ্য গ্রহণ হারসহ খাদ্যের হজম হার বৃদ্ধি পায়। মাছের শরীরে খাদ্যের আত্তিকরণ (Assimilation) বৃদ্ধি পায় ফলে সার্বিকভাবে খাদ্যের FCR এর মান ভাল হয়। ফলে কম খাবারে মাছের অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে ৫ বছর আগের বাজারে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্য আর বর্তমানে প্রাপ্ত খাদ্যের মানগত দিক দিয়ে অধিক ভাল এবং পরিপূর্ণ (Balance)। খাদ্যে আমিষের পূর্ণতা (Completeness) এবং ভারসাম্যের কারণে খাদ্যের পুষ্টিমান অনেক উন্নত হয়েছে। অধিক পুষ্টিকর খাবার প্রদানে মাছ চাষ করলে পুকুরের পানির দ্রবণীয় অক্সিজেন মাত্রা সাধারণ মাত্রার থেকে অবশ্যই বেশি থাকতে হবে। কারণ অধিক পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করলে তার হজমের জন্য শরীরে শক্তি অধিক ব্যায় করতে হয়। শক্তি যোগানে রক্ত প্রবাহে অক্সিজেনের মাত্রা একটি নিয়ন্ত্রক উপাদান। যেমন আমরা মানুষরা যখন অধিক পুষ্টি বা আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য বেশি গ্রহণ করি তখন কিছুটা অস্বস্থি বোধকরি এবং শরীরে ঘামের সৃষ্টি হয়। অধিক আরামের জন্য আমরা গাছের নীচে শুশিতল ছায়ায় বা ফ্যানের বাতাসে বসি কারণ খাদ্য গ্রহণের পর আমাদের শরীরের বিপাক ক্রিয়া (Physiological Activities) শুরু হয়ে যায় এবং আমিষ ভেঙ্গে সরলীকরণে অধিক শক্তি ক্ষয় হয় এবং এই শক্তির যোগান দিতে বাড়তি অক্সিজেনের এবং পানির প্রয়োজন হয়। বিষয়টি মাছের ক্ষেত্রেও অনুরুপ। মাছকে আমরা বর্তমানে বেশ উন্নত মানের অধিক আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াচ্ছি ফলে তাকে বাড়তি অক্সিজেনের সংস্থান না করলে খাদ্য সঠিকভাবে হজম হবে না এবং শরীরে আত্তিকরণের পরিমাণ কমে যাবে এবং মূল্যবান খাদ্য পায়খানা আকারে বের হয়ে আসবে। এর ফলে একদিকে মূল্যবান খাদ্যের অপচয় ঘটল এবং পুকুরের পানিতে অনাত্তিকৃত খাদ্যের অংশ যুক্ত হয়ে পুকুরের পানির পরিবেশ দ্রুত নষ্ট করে ফেলে। তাই যে সব মৎস্য খামারে উন্নতমানের খাবার ব্যবহার করে মাছ চাষ করা হচ্ছে তাদের অনতি বিলম্বে এ্যারেটর সংযুক্ত করা উচিত। এতে যে শুধু খাদ্যের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে তা নয়, চাষের পুকুরে উদ্ভুত নানা ধরনের গ্যাসের সমস্য উপসমে কাজ হবে। এ্যারেটর ব্যবহার করলে পানিতে শ্রোত সৃষ্টি হয় তাতে পানির উপর-নীচে পরিসঞ্চালনের সৃষ্টি হয় এবং পুকুরের তলার পানি বাতাসের সংস্পর্শে আসার কারণে পানি থেকে দ্রবিভূত নানা ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে ফিরে যায়। যারা এ্যারেটর ব্যাবহার করছেন তাঁদের বক্তব্য এর ব্যবহারে মাছের খামারে ঔষধ খরচ একবারেই লাগে না। এ্যারেটর ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়। স্বল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা যায় বলে এর ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিংড়ি চাষির জন্য এ্যারেটর খুবই উপকারি।

চিত্র ২ ঃ প্যাডেল হুইল এ্যারেটর।

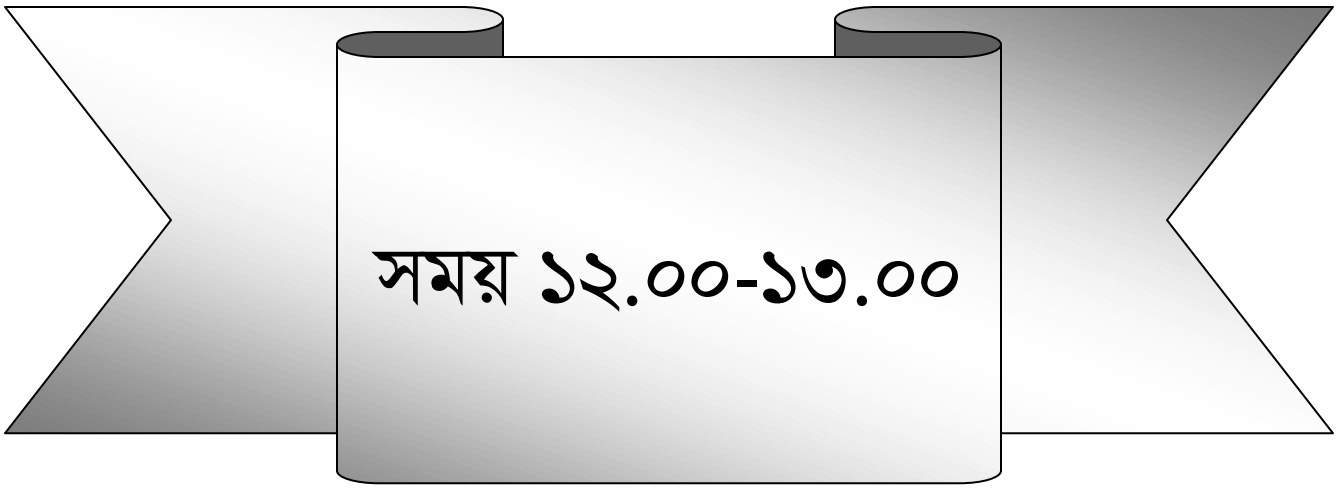

- মৎস্যখাদ্য তৈরির মেশিন ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, ব্যবহার

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময় ১২.০০-১৩.০০	**মেয়াদকাল:** ৬০ মিনিট

শিরোনাম: মৎস্যখাদ্য তৈরির মেশিন ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, ব্যবহার

অভীষ্ট দল: উদ্যোক্তাগণ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মৎস্যখাদ্য তৈরির মেশিন ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করা হবে। এই জ্ঞানের সাহায্যে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়িক জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

উদ্দেশ্যঃ *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- মৎস্যখাদ্য তৈরির মেশিন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মেশিনের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০মিনিট
	• মৎস্যখাদ্য তৈরির মেশিন • মেশিনের বিভিন্ন অংশ • মেশিনের ব্যবহার	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			৫মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ভিপকার্ড, ভিডিও ক্লিপ, ল্যাপটপ, ইত্যাদি।			

মৎস্যখাদ্য তৈরির মেশিন ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, ব্যবহার

১. মৎস্য খাদ্য তৈরির মেশিন ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচিতি

বিগত ১৯৯৪ সনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্পূর্ণ দেশিয় পদ্ধতিতে স্থানীয় মালামাল ব্যবহার করে অগ্রসর চাষি পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য মাছের দানাদার খাদ্য/ ভেজা পিলেট খাদ্য তৈরীর প্রথম মেশিন উদ্ভাবন করে এবং ১৯৯৮ সনে তার আরও উন্নত মডেল উদ্ভাবন করা হয়। আদর্শ সাইজের ১০ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন পিলেট মেশিনটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি ঘণ্টায় ১০০-১৫০ কেজি এবং বাজার মূল্য ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে সহজ প্রযুক্তিতে দেশিয় কাঁচামাল ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যের খামার উপযোগী সেমি-অটো পিলেট মেশিন উদ্ভাবন করা হয় যা দিয়ে শুষ্ক পিলেট বা দানাদার শুষ্ক খাবার তৈরী করা যায়। ২০ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন সেমি-অটো পিলেট মেশিনটিতে প্রতি ঘণ্টায় ১৫০-২০০ কেজি শুষ্ক দানাদার বা পিলেট খাদ্য তৈরী করা যায় এবং বাজার মূল্য ৬৫,০০০-৭০,০০০ টাকা। মটরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সেইসাথে মেশিন দুইটির দৈহিক কাঠামো পরিবর্তন করে এর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। ৩০ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ডিজেল মেশিন দিয়ে স্থানীয়ভাবে তৈরি একটি পিলেট মেশিন দিয়ে ঘন্টায় ৪০০-৫০০ কেজি খাবার উৎপাদন সম্ভব।

মৎস্য খাদ্য তৈরির মেশিনের প্রধানত তিনটি অংশ থাকে।

পাউডার তৈরি অংশ (Crashing unite) ঃ এ অংশে খাদ্য উপকরণ মাড়াই করে সূক্ষ অংশে বিভক্ত করা হয়। খাদ্য উপকণ যে অবস্থায় গস্থহণ করা হয় সে অবস্থায় পিলেট তৈরিতে ব্যবহার করা য়ায় না। উৎপাদিত খাদ্যের কার্যকরিতা বৃদ্ধির জন্য উপকরণ অবশ্যই গুড়া করে নিতে হয়।

মিশ্রণ অংশ (Mixing unit) : এ অংশে খাদ্য উৎপাদনে সূত্র অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণের পরিমাণ মত মেশিনে ঢেলে ভালভাবে মিশ্রণ করা হয়। উপকরণ ভঅল ভাবে না মিশালে খাদ্যের সমসত্বতা থাকে না।

পিলেটিং অংশ (Pelletting unit) এ অংশে মিশ্রিত খাদ্য উপকরণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানিসহ আধারে দেয়া হয় এবং এখানে খাদ্য ছাকনির আকার অনুযায়ী পিলেট হয়ে বের হয়ে আশে। পিলেটের আকার যে মাছের জন্য খাদ্য তৈরি করা হচ্ছে তার চাহিদা অনুয়ায়ী পিলেটের দানার আকার করা হয়।

চিত্র ঃ স্থানীয় ভাবে তৈরি ছোট আকারের পিলেট খাবার তৈরির মেশিন

অনেক মেশিনে কেবল পিলেটিং অংশ থাকে সে ক্ষেত্রে উপকরণ কেনার সময় গুড়া অবস্থায় কিনতে হবে এবং সরিষান খৈল পানিতে আগেই ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকল খাদ্য উপকরণের পাউডারগুলোকে পরিস্কার শুকনো মেঝেতে বা পলিথিনের ওপর ঢেলে সামান্য পানি যোগ করে ভালোভাবে মিশাতে হবে। অতপর পিলেট মেশিনে দিয়ে পিলেট তৈরি করা যেতে পারে। ছোট আকারে মেশিন ১,১০,০০০-১,২০,০০০ টাকায় তৈরি করা সম্ভব। উৎপাদিত খাদ্য প্রায় শুকনো হিসেবেই বের হয় এবং সাথে সাথেই পুকুরে ব্যবহারের উপযোগি বা সংরক্ষণের জন ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। মেশিনের সাথে তিনটি চাকা সংযুক্ত করে এটিকে ভ্রাম্যমান করাও সম্ভব। সাধারণত স্থানীয়ভাবে তৈরি এসব খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমান নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বলে সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মধ্যে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। তবে কড়া রোদে সামান্য শুকিয়ে ব্যবহার করলেও ভালো ফল পাওয়া যাবে। মৎস্য অধিদপ্তরের এনএটিপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে এ ধরণের মেশিন ইতোমধ্যে চাষিদের মধ্যে বিতরণ শুরু হয়েছে। ছোট ছোট গ্রুপভিত্তিক মৎস্যচাষিরাও এ ধরণের মেশিন ব্যবহার করতে পারে। তারা তাদের পছন্দমত উপকরণ সংগ্রহ করে শুধুমাত্র ডিজেল তেল ব্যবহার করে গুণগতমানের খাদ্য তৈরি করতে পারে। আবার ছোট ছোট উদ্যোক্তা বা বানিজ্যিক চাষিরাও এ মেশিন ব্যবহার করে খাদ্য খরচ কমাতে পারে। মেশিনটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য একটানা ৪-৫ ঘন্টার বেশি চালানো ঠিক নয়।

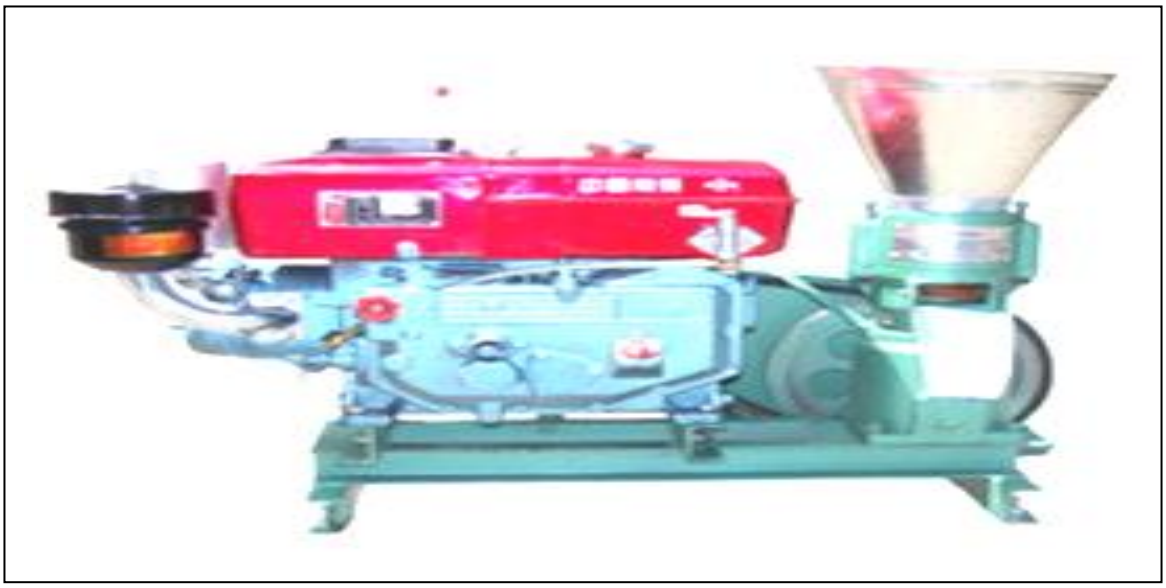

চিত্র ঃ স্থানীয় ভাবে তৈরি ছোট আকারের ভিন্ন ধরনের পিলেট খাবার তৈরির মেশিন

চিত্র: স্বল্পমূল্যের পিলেট মেশিন (পিলেটিং ও চূর্ণকরণ অংশসহ)

চিত্রঃ স্বল্পমূল্যের ছোট আকারের ভাসমান খাদ্য তৈরির মেশিন

স্থানীয়ভাবে নির্মিত এধরনের পিলেট মেশিন **ছোট** বড়-খামারী সকল খামারি গণ সহজেই পরিচালনা করতে পারেন। এর মূল্য কম এবং ব্যবহারবিধি সহজ বিধায় অনেক খামারী এখন নিজেরাই এই সংযোজিত মেশিন দ্বারা নিজেরাই মাছের খাবার তৈরী করে নিচ্ছেন। এর সুফল অনেক–

১. যে কোন পিলেট খাবারের ন্যায় এই খাবারেও অপচয় বহুলাংশে হ্রাস পায় ফলে খাদ্য ব্যয়ও হ্রাস পায়।
২. অপচয় হ্রাসের ফলে পুকুরের পানি অপেক্ষাকৃত বেশী পরিস্কার থাকে। মাছের পরিবেশ সুস্থ রেখে অধিক উৎপাদনে সহায়তা দেয়।
৩. নিজের পছন্দমত বা প্রয়োজনমত উপকরণ দিয়ে যখন প্রয়োজন তখনই খাবার তৈরী করে নেয়া যায়।
৪. সংযোজিতব্য যন্ত্রপাতি প্রায় সর্বত্র স্থানীয়ভাবেই পাওয়া যায়।
৫. সংযোজিত এই মেশিন সহজে মেরামত বা সংস্কার করা যায়।
৬. সর্বোপরি, এর মাধ্যমে তৈরী খাবারের উৎপাদন ব্যয় কম বিধায় মাছচাষীর মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

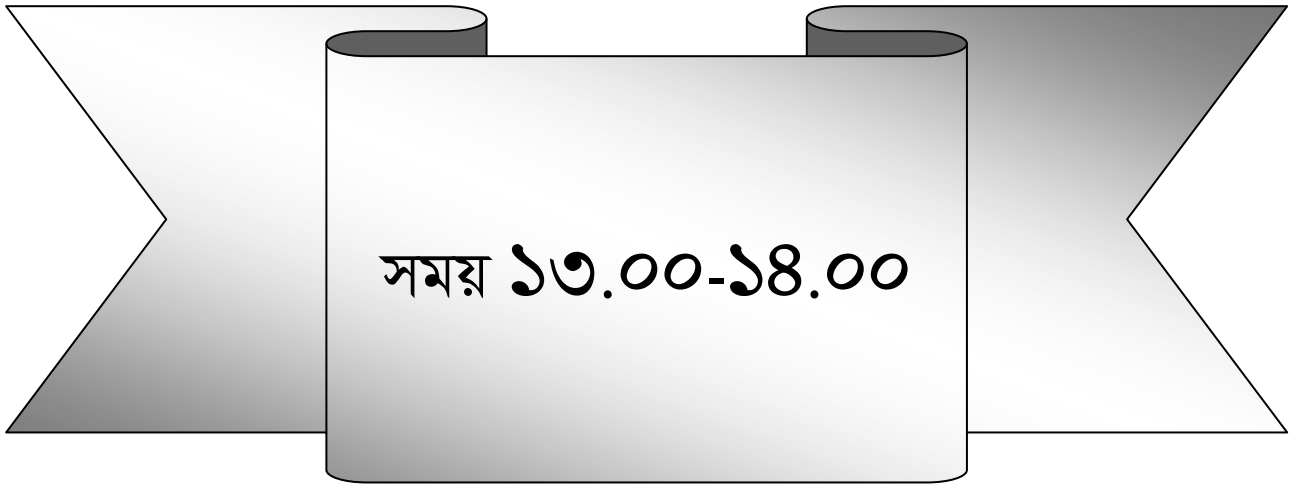

- স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্যখাদ্য তৈরি, মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ, এবং মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময় ১৩.০০-১৪.০০	**মেয়াদকাল:** ৬০ মিনিট

শিরোনাম: স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্যখাদ্য তৈরি, মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ, এবং মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা

অভীষ্ট দল: উদ্যোক্তাগণ

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্য খাদ্য তৈরি, মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ এবং মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে অবহিত করা হবে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়িক জীবনে এই জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবেন।

উদ্দেশ্যঃ *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্যখাদ্য তৈরি করতে পারবেন।
- মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানবেন ও বলতে পারবেন।
- মাইকোটক্সিনস এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানবেন ও বর্ণনা করতে পারবেন।
- গুদামজাতকরণ ও পরিবহনের নিয়মসমূহ অবহিত হবেন।
- মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫ মিনিট
	• স্বাগত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৫০মিনিট
	• স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্য খাদ্যতৈরি • মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ • মাইকোটক্সিনস এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব • গুদামজাতকরণ ও পরিবহনের নিয়মসমূহ • মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			৫মিনিট
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ভিপকার্ড, ভিডিও ক্লিপ, মাল্টিমিডিয়া/ল্যাপটপ, ইত্যাদি।			

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্য খাদ্য তৈরি, মোড়কজাতকরণ (প্যাকেজিং) ও সংরক্ষণ এবং মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা

১. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্য খাদ্য তৈরি, প্যাকেজিং ও সংরক্ষণ

উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের মান সঠিক ভাবে সংরক্ষণের জন্য যথাযথ নিয়মে মোড়কজাত করে সংরক্ষণ বা বাজারজাত করা প্রয়োজন। যোকোন উৎপাদিত পণ্য মোড়কজাত করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। মাছের খাদ্য এর ক্ষেত্রে মৎস্য খাদ্য আইন ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধি মালা ২০১১ এ স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১.১ প্যাকেজিং ও লেবেলিং (Packaging and labeling)

- প্যাকেজিং এর উদ্দেশ্য হলো- আলো, আর্দ্রতা ও অন্যান্য পরিবেশগত দূষণের হাত থেকে তৈরি খাদ্যপণ্য রক্ষা করা। তাছাড়া, ইহা তৈরি খাদ্য উৎপাদকের পরিচিতি ও খাদ্যের প্রকারভেদ নির্দেশ করে। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানে অনুমোদিত বস্তু দ্বারা প্যাকেট বা ব্যাগ তৈরি করতে হবে এবং তাতে বায়ু নিরোধ অবস্থায় খাদ্যপণ্য মোড়কজাত ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- তৈরি খাদ্যপণ্যের পাত্র বা ব্যাগে সংরক্ষিত পণ্যের বর্ণনা, যে প্রজাতির জন্য তৈরি তার নাম, উৎপাদন ও মেয়াদোর্ত্তীণের তারিখ, ওজন, উপকরণের নাম এবং এমন কোন ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় সতর্কতাসহ সুনির্দিষ্ট ব্যবহার নির্দেশনার উল্লেখ থাকতে হবে।
- তৈরি খাদ্যপণ্যের প্যাকেজিং ও লেবেলিং এর ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত কার্যাদি সম্পন্ন করতে হবেঃ
  - ব্যাগে সংরক্ষণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে ব্যাগিং এর সকল যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ও পরিষ্কার করতে হবে
  - পরিমাপ যন্ত্রেও সঠিকতা ও খালি ব্যাগের ওজন যাচাই করতে হবে।
  - দিনের উৎপাদিত পণ্যের ব্যাগ ও লেবেলিং ট্যাগ যথাযথভাবে কোড প্রদত্ত হয়েছে কিনা যাচাই করতে হবে।
  - উৎপাদনের শুরুর দিকে খাদ্যের নির্দিষ্ট গঠন ও মান যে পর্যন্ত কাঙ্খিত মাত্রায় না আসবে সে পর্যন্ত আলাদা করে রাখতে হবে। এগুলো যদি নির্দিষ্ট মানের না হয় তাহলে পূনঃতৈরি করা যাবে। ঔষধমিশ্রিত খাদ্যের ক্ষেত্রে পুনঃউৎপাদনে মিল তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
  - প্রতি শিফটের শুরুতে এবং শিফটের আগাগোড়া মাঝে মাঝে ব্যাগভর্তি খাদ্যের ওজন পরীক্ষা করতে হবে। পরিমাপযন্ত্র বার্ষিকভিত্তিতে বিএসটিআই এর প্রত্যয়ন নিতে হবে।
- আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান ও সরকারি খাদ্য বিধান অনুসারে খাদ্যভর্তি ব্যাগে অথবা সেটে দেওয়া ট্যাগে নিম্নেবর্ণিত তথ্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে ঃ
  - উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
  - প্যাকেট বা ব্যাগে রক্ষিত খাদ্যেও প্রকৃত ওজন
  - ব্যবহৃত খাদ্য ফর্মুলার নম্বর এবং খাদ্যে বিদ্যমান নিভিন্ন পুষ্টির উপাদানের শতকরা হার
  - খাদ্য চিহ্নিত করার জন্য প্রদেয় ব্যাচ ও লট নম্বর
  - আমদানিকৃত খাদ্য উপকরণসমূহের উৎস শনাক্তকরণ কোড বা তথ্যবলি
  - খাদ্যের ধরন ও অভিষ্ট প্রজাতির নাম
  - খাদ্য প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
  - খাদ্য প্রয়োগ প্রণালী

লেবেলিং (**Labeling**) এর জন্য খাদ্য উৎপাদন কারির দায়িত্ব হবে ঃ

- ট্যাগ এর নকশা ও মুদ্রণ কাজ সমন্বয় করা
- ট্যাগ ছাগানোর পূর্বে সরকারি বিধানের সাথে এর সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করা
- মূদ্রিত ট্যাগ এমনভাবে গ্রহণ, হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণ করা যাতে খাদ্যে নির্ধারিত লেবেল লাগানো নিশ্চিত হয়

- ব্যাগিং এর সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাগ ব্যাগিং এলাকায় রাখতে হবে। তারিখ দেওয়া অতিরিক্ত ব্যাগ অবিলম্বে নষ্ট করে ফেলতে হবে। স্তুপিকৃত খোলা খাবারের ক্ষেত্রে লেবেল ও খাদ্য প্রয়োগ নির্দেশনা চালানের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১.২ গুদামজাতকরণ ও পরিবহন সময় যে বিষয়ে মনোযোগী থাকতে হবে ঃ

- মৎস্য খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার মতই তৈরি খাদ্যপণ্য গুদামজাতকরণ ও পরিবহণে প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে
- আদ্রর্তা রোধের জন্য খাদ্যভর্তি ব্যাগ সরাসরি মেঝের উপওে রাখা যাবে না। এগুলো ষ্টীল, লোহা বা কাঠের তৈরি পাটাতন পেতে তার উপরে সূর্যের আলোমুক্ত পরিবেশে গুদামজাত করতে হবে। দুই পাটাতনের মাঝখানে অন্তত এক তৃতীয়াংশ মিটার ফাকা জায়গা রাখতে হবে যাতে ভালভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে।
- পণ্য গুদামজাতকরণে 'আগের পণ্য আগে ব্যবহার' (First in, first out) নীতি অনুসরণ করতে হবে
- প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্রটির কারণে কোন নির্দিষ্ট পণ্যের ব্যাচ প্রত্যাহার করার সুবিধার্থে বিতরণ ও পরিবহন সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- খোলা খাদ্যপণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এমনভাবে রক্ষা করতে হবে যাতে ট্রাক বা পরিবহন যানের প্রত্যেক কামরার পণ্য শনাক্ত করা সম্ভব হয়।
- বস্তাবন্দি চালানকৃত খাদ্যপণ্য ভাল অবস্থায় থাকতে হবে, ওজনে সঠিক হতে হবে এবং চালান ও বিলের কপি সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।
- ঔষধযুক্ত (Medicated) খাদ্যপণ্য পরিবাহিত ট্রাক যথাযথভাবে ফ্লাশ করতে হবে যাতে পরবর্তী পরিবহন পণ্য ক্ষতিকর বা অননুমোদিত রাসায়নিক দ্বারা দূষিত না হতে পারে।
- তৈরি খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে টার্গেট প্রজাতি ও মানবস্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সংরক্ষণকালে কোন খাদ্য নষ্ট হয়ে গেলে তা বিষাক্ত (মাইকোটটক্সিন) হয়ে যেতে পারে যা মাছ ও মানুষের জন্য মারাত্নক ক্ষতিকারক।

১.৩ মাইকোটক্সিনস এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব

খাবারে মাইকোটক্সিনস এর উপস্থিতি খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সাধারণত ক্রটিপূর্ণ গুদামজাতকরণের কারণে মৎস্যখাদ্য উপকরণ বা তৈরিকৃত মৎস্যখাদ্যে ফাঙ্গাস জাতীয় উদ্ভিদ থেকে এক ধরণের বিষ তৈরি হয় যাকে মাইকোটক্সিন বলে। এ বিষ খাবারের মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। অত:পর হেপাটোসেলুলার কারসিনোমা বা লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। আমাদের দেশেও কখনো কখনো মাছ, মুরগি ও ডেইরি খাবারে মাইকোটক্সিনের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ ধরণের খাবার খেয়ে মাছসহ চাষের প্রাণীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। লিভারসহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। মাইকোটক্সিন খাবার খেলে প্রাণিদেহে এর মাত্রাতিরিক্ত অবশেষ বা রেসিডিউ থেকে যেতে পারে। এমনকি প্রাণিদেহ হতে মানবহেে স্থানান্তরিত হয়েও এর বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হতে পারে। এ বিষের মূল উৎস এসপারজিলাস মোল্ড যা কিনা মূলত দানাদার শস্য ও তৈলবীজ জাতীয় ফসলে জন্মায়। এসব উপকরণ মানুষ বা প্রাণিখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় যে কোন পর্যায়ে এসপারজিলাস জন্মাতে পারে ও বিষ তৈরি হতে পারে। এসব ফসল আহরণ ও আহরণ পরবর্তী সংরক্ষণ, প্যাকিং, হ্যাণ্ডলিং ও গুদামজাতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আধাপাকা বা কম পাকা শস্য আহরণ করা ঠিক না। এতে মাইকোটক্সিন তৈরি হতে পারে। ফসল কর্তনের পর ভালোভাবে শুকাতে হবে যেন কোন ভিজেভাব বা ময়েশ্চার যেন শতকরা ১৪ ভাগের কম হয়। উপযুক্ত জায়গায়, উপযুক্ত পাত্রে/ব্যাগে ফসল সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সংরক্ষিত ফসলের আর্দ্রতা বেড়ে না যায়। কোনো স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে ফসল রাখা চলবে না। খৈল বেশি শুকিয়ে যাওয়া যেমন ভালো না, আবার বেশি আর্দ্রতা বা ভিজে ভাবও ভালো না। মাছের খাবার তৈরিতে ভিজা অধিক আর্দ্রতাযুক্ত (শতকরা ১৪ ভাগের বেশি), চাপধরা, বিবর্ণ, পোকায় খাওয়া উপকরণ মিলগেটে পরিহার করতে হবে। আর্দ্রতা পরীক্ষা করার পর উপযুক্ত হলেই কেবল গুদামে ঢুকানোর অনুমতি দিতে হবে। খামারে বা বাড়িতে মৎস্য খাদ্য তৈরিতেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মৎস্যখাদ্য উপকরণ কেনার পূর্বে এর উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ইতিহাস জেনে নিতে হবে। কম পরিপক্ক শস্য কর্তন করা হলে তা চিমটে লেগে যায় এবং এ ধরণের উপকরণ পরিহার করাই ভালো। খাদ্য কারখানায় ভালো গুদামঘরে ভালোভাবে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে। ভিজা স্যাঁতসেঁতে ঘরে ও মেঝেতে খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ করা যাবে না। উপকরণের প্যাকিং ভালো হওয়া খুব জরুরী। গুদামে মালামাল ছোট ছোট স্তুপে সাজানো, গুছানো ও পরিপাটি রাখতে হবে যেন বাতাস ও মানুষ চলাচলে কোন অসুবিধা না হয়। মাছের খাবার সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক ধারণা হলো- যেসব উপকরণ

মানুষের খাবার তৈরির অনুপোযোগী তা কম দামে কিনে মাছের খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। আমাদের এ ধারণা বদলাতে হবে। মৎস্যখাদ্য উৎপাদনে ইসি রেগুলেশনে এর সর্বোচ্চ মাত্রা ২ মাইকোগ্রাম প্রতি কেজি খাবারে এবং আমাদের দেশেও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১১ এর তফসিল ৭(ক)(৮) এ এর সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই মৎস্যখাদ্য তৈরিতে মাইকোটক্সিন সংক্রমিত হতে পারে এমন উপকরণ যেমন গম, ভুট্টা, খৈল, সোয়াবিন প্রভৃতি খাদ্য কারখানায় সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া তৈরিকৃত খাদ্যও প্যাকেজিং ও সংরক্ষণে গুদাম/ডিপোতে উত্তম সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে যেন কোন প্রকার ফাঙ্গাস তথা মাইকোটক্সিনস জন্মাতে না পারে।

২. মৎস্যখাদ্য আইন ও বিধিমালা

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে খাদ্যে চাহিদা। আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দিতে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে মাছে চাষ। উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন হ্রাসের ফলে পুষ্টির চাহিদা পূরণে চাষের মাছের গুরুত্ব সময়ের সাথে বেড়েই চলেছে। ১ কোটিরও অধিক এই বিশাল জনগোষ্টির প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগের বেশি যোগান দেয় মৎস্য খাত। বাণিজ্যকভাবে মৎস্যচাষের জন্য মৎস্য খাদ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানসম্মত মাছ উৎপাদনের জন্য মানসম্মত মৎস্য খাদ্যের কোন বিকল্প নাই। বাণিজ্যিকভাবে মাছচাষ সম্প্রসারণের সাথে সাথে সম্প্রসারিত হয় মৎস্য খাদ্য সেক্টর। গড়ে ওঠে নতুন নতুন মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারি কারখানা। মৎস্য খামারে ছোট পরিসরে ছোট ছোট খাদ্য উৎপাদনকারি নানা রকম মেশিন প্রচলন হয়। সেই সাথে গড়ে ওঠে বৃহত মৎস্য খাদ্য কারখানা। কোন আইনি কাঠামো না থাকায় খাদ্যে মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। মৎস্য খাদ্যে নানা অপদ্রব্য মেশানো, সঠিকমাত্রায় পুষ্টি গুণাগুন বজায় না থাকা, উৎপাদিত মাছের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। মানসম্মত নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আইনি কাঠামোর।

মৎস্যচাষ প্রযুক্তির আধুনিকায়ন ও দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে বাণিজ্যিক মৎস্য খাদ্যের ব্যবহার ধারবাহিকভাবে বাড়ছে । ২০০৮ সালে বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্য কারখানা ছিল ৬০টি এবং স্থায়ীয়ভাবে তৈরি ডুবন্ত পিলেট খাদ্য তৈরির কারখানা ছিল ৬০০টির ও অধিক। তখন এদের উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের বিভিন্ন উপকরণের যৌক্তিক মিশ্রণ ও গুণাগুন নিয়ে ব্যবহারকারিদের মধ্যে ব্যাপক অভিযোগ ও বিরুপ মন্তব্য ছিল। কারণ দেশে তখন আদর্শ মৎস্য খাদ্যের নির্দেনা ও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বিষয়টি মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নজরে আসে। দ্রুত বর্ধনশীল এই মৎস্য সেক্টরে ভালো মানের মৎস্য খাদ্য, ভালো পোনা, এডিটিভস, ঔষধ, রাসায়নিক উপকরণ, মোড়কজাত সামগ্রি, খাদ্য নিরাপত্তা, জৈব নিরাপত্তা বিষয়ে উপলব্দি করা হয়। বিষয়টি নিয়ে খাদ্য উৎপাদনকারি, পুষ্টিবিদ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, সংশ্লিস্ট সরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ তৎকালীন গবেষণা লব্দ আদর্শ মাত্রা, উন্নয়নের জন্য বিবেচনা করেন। তখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, USFDA, WHO, FAO এর Standard অনুসরণ করে ২০০৮ সালে সরকার "মৎস্য ও পোল্ট্রি খাদ্য অর্ডিনেন্স ২০০৮" জারি করেন। পরবর্তীতে বিষয়টি এরা যুগোপযোগি ও যৌক্তিকীকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে "মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০" জাতীয় সংসদে পাশ করেন। আইনের ৩ নং ধারার নির্দেনা মোতাবেক ২০১১ সালে সরকার "মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১" প্রণয়ন করেন। মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এ মোট ২৪টি ধারা রয়েছে। মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ তে মোট বিধি রয়েছে ১০টি। এই আইন মৎস্য খামারী, মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারি, মৎস্য খাদ্য উপকরণ আমদানিকারক, মৎস্য খাদ্য বিক্রেতাসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের কাছে এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

- **মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১**

মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০*

ধারা-৩: মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৎস্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হইবেন।

ধারা-৪: লাইসেন্স ব্যতীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইত্যাদি

এ আইন কার্যকর হইবার পর কোন ব্যক্তি ধারা ৬ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবেন না।

ধারা-৫: লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা মহাপরিচালক কর্তক এতদুদেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির কোন কর্মকর্তা লাইসেন্সিং কর্তপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন।

---

*আংশিক

ধারা-৬: লাইসেন্স প্রদান

১. কোন ব্যক্তি মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরন এবং আনুষঙ্গিক কর্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে আবেদন করিতে পারিবেন।

২. লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হইলে কর্তপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ করিয়াছেন তবে নির্ধারিত ফী আদায় করিয়া ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

৪. এ আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলিতে জড়িত কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের জন্য আবেদন না করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিবে।

ধারা-৭: লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন

১. এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর।

২. লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত ফি সহ নবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করিতে হইবে।

৩. আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী লাইসেন্সের শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিয়াছে তবে আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নবায়ন ফি পরিশোধ সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়ন করিবেন অন্যথায় আবেদনটি নামমঞ্জুর করিবেন এবং লিখিতভাবে লাইসেন্স গ্রহীতাকে অবহিত করিবেন।

ধারা-৮: লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি

এই আইনের অধীনে প্রদেয় লাইসেন্স এর ফি ও নবায়ন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা-৯: লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিতকরণ

১. কোন লাইসেন্স গ্রহীতা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে কর্তপক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারন দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রদত্ত লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

২. কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হইলে স্থগিত বা বাতিল আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহীতা সরকারের নিকট নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আপীল করিতে পারিবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩. আপীল আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ধারা-১০: আদর্শ মাত্রা

১. সরকার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের গুনগতমান বজায় রাখিবার লক্ষে বিধি দ্বারা মৎস্য খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের আদর্শ মাত্রা নির্ধারণ করিয়া দিবে এবং উক্ত আদর্শ মাত্রা অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে।

২. মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে ও পরীক্ষায় আদর্শ মাত্রা না পাওয়া গেলে বা পুষ্টি বিরোধী কোন উপাদানের উপস্থিতি প্রমাণিত হইলে বা উহাতে মৎস্যখাদ্যের অযোগ্য বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্যের মিশ্রণ পাওয়া গেলে উক্ত মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।

ধারা-১১: মৎস্য খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ

১. মৎস্য খাদ্যের মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন উৎপাদক, আমদানিকারক বা বিক্রেতার নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাইতে পারে।

২. পরীক্ষায় মৎস্যখাদ্য ব্যবহারের অনুপযোগী প্রমাণিত হইলে উক্ত মৎস্যখাদ্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং উহার আমদানিকারক, উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারী এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা-১২: ক্ষতিকর ও ভেজাল মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন ও বিপণন নিষিদ্ধ

১. কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন কোন মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি-রপ্তানি বিক্রয়, পরিবহন বা বিতরণ করিতে পারিবেন না:

ক) যাহাতে মানুষ, মৎস্য বা পরিবেশের জন্য কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর পদার্থ থাকে।

খ) যাহা আদর্শমাত্রার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।

৩. কোন ব্যক্তি উপরোক্ত বিধান লংঘন করিলে উহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

ধারা ১৩: পাত্র ও লেবেলিং

১. কোন মৎস্যখাদ্য বাজারজাত করা যাইবে না যদি-

ক) উক্ত খাদ্য অনুমোদিত পাত্র বা প্যাকেটে সংরক্ষিত এবং বায়ুনিরোধ অবস্থায় মোড়কজাত না হয়।

খ) উক্ত পাত্র বা প্যাকেটে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো উল্লেখ না থাকে,

যথা: ১) প্রস্তুতকারকের নাম ও যে দেশে প্রস্তুত সেই দেশের নাম;

২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর;

৩) মৎস্যখাদ্যের প্রকৃত ওজন;

৪) বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের ও পুষ্টি উপাদানের নাম এবং শতকরা হার;

৫) মৎস্যখাদ্য চিহ্নিত করার জন্য প্রদেয় লট নম্বর বা অন্যবিধ উপায়;

৬) উৎপাদিত পণ্যের উৎস শনাক্তকরণ কোড;

৭) কোন জাতীয় মৎস্য খাদ্য তাহার উল্লেখ;

৮) উৎপাদনের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ;

ধারা-১৪: মৎস্যখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ

১. মৎস্যখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশকসহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইবে না।

২. কোন ব্যক্তি এই বিধান লংঘন করিলে উহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

ধারা-১৫: কারখানা বা সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশের ক্ষমতা

মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গত সময়ে কোন মৎস্যখাদ্য কারখানা ও উহার প্রাঙ্গণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, মৎস্যখাদ্যের যে কোন উপাদান ও উপাদানসমূহ মজুদ করিবার স্থান, পরিবহনকারী যে কোন যান, বিতরণ কেন্দ্র বা এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোন স্থান বা যানবাহন এবং মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে কোন দলিল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

ধারা-১৬: ক্ষতিকর ও ভেজাল খাদ্য বাজেয়াপ্তকরণ, বিনষ্টকরণ

১. কোন মৎস্যখাদ্য ক্ষতিকর ও ভেজাল প্রমাণিত হইলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত মৎস্যখাদ্য এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত পণ্য ও যন্ত্রপাতির সমুদয় বা কোন অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

২. বাজেয়াপ্ত অস্বাস্থ্যকর বা পচা দূষিত বা ভেজাল মিশ্রিত মৎস্যখাদ্য মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনষ্ট করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা-১৮: অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ ও বিচার

১. মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

২. ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

ধারা-১৯: অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা

১. এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

ধারা-২০: দন্ড

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনুরুপ অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ৫০০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উক্ত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা-২১: অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা

ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইন অনুমোদিত যে কোন দন্ড আারোপ করিতে পারিবে।

মৎস্য/চিংড়ি চাষ/ হ্যাচারিতে ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ এবং অনুমোদিত রাসায়নিক সামগ্রী ও ঔষধপত্রের তালিকা (মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা–২০১১ তফশীল–৩)

LIST OF RESTRICTED & APPROVED DRUGS
CHEMICALS FOR AQUACULTURE

গ্রুপ-এ (Group-A)		গ্রুপ-সি (Group-C)
ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ রাসায়নিক সামগ্রী ও ঔষধপত্রের তালিকা)		ক) নিম্নলিখিত রাসায়নিক সামগ্রী USFDA এবং NFI অনুমোদিত মাত্রানুসারে ব্যবহার করা যাবেঃ
LIST OF RESTRICTED & APPROVED DRUGS & CHEMICALS		১. কোরিওনিক গোনাডোট্রপিনঃ
১। স্টীলবিনস এবং সহযোগী লবণ ও তার এ্যাস্টার (চিংড়ি হ্যাচারি/ খামারের জন্য উক্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিতে হবে)		স্পনিং' এর জন্য ব্রুডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।
২। স্টেরয়েড।		২. ফরমালিনঃ
৩। ইসি নির্দেশিত ২৩৭৭/৯০, ২৬ জুন ১৯৯০ এর সংযুক্ত ৪ এর উল্লেখিত ড্রাগসমূহঃ		প্রোটোজোয়া, মনোজেনেটিক ট্রেমাটোড এবং ফাংগাস নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যাবে।
(ক) ক্লোরামফেনিকল		খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হবে এমন কোন মৎস্য বা তার মাংসল অংশে ব্যবহার করা যাবে না।
(খ) ক্লোরোফর্ম		৩. অক্সিটেট্রাসাইক্লিনঃ
(গ) ক্লোরোপ্রমাজিন,		চিংড়ি ও মাছের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।
(গ) কোলছিসিন,		ব্যবহারের কমপক্ষে ৩০ দিন পর মৎস্য ধরা যাবে।
(ঙ) ডেপসন,		৪. সালফাডাইমিথোক্সিন বা আরমেট্রপিন যৌগঃ
(চ) ডাইমেট্রিডায়াজল		চিংড়ি/ মৎস্যে ব্যবহার করা যাবে।
(ছ) মেট্রোনিডায়াজল		ব্যবহারের কমপক্ষে ৪২ দিন পর মৎস্য ধরা যাবে। মৎস্যের মাংসল অংশে এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.১ পিপিএম।
(জ) নাইট্রোফিউরান, এবং		(খ) বিভিন্ন রাসায়ানিক পদার্থের গ্রহণযোগ্য মাত্রাঃ

(ঝ) রোনোডাজন

১, ২ ও ৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে বছরে অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করে তার প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে।

গ্রুপ-বি (Group-B)

প্রাণির চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা যাবে এমন ঔষধপত্র এবং তার অবশিষ্টাংশঃ

১। সালফোনিলামাইডস এবং কুইনোলনস।

২। (ক) অন্যান্য পশু বা প্রাণির চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ।
(খ) এ্যাসথালমিনটিকস।

৩। অন্যান্য দ্রব্য এবং পরিবেশ হতে মিশ্রিত অবশিষ্টাংশ-
(এ) PCBs সহ অরগানো-ক্লোরিন যৌগ।
(বি) অরগানো-ফসফরাসের যৌগ
(সি) রাসায়নিক পদার্থ।
(ডি) মাইকোটক্সিন।
(ই) রং।

৩ নং ক্রমিকের দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে বছরে অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করে তার প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে।

গ্রুপ-সি (Group-C)

(ঘ) বিভিন্ন এন্টিব্যাকটেরিয়াল দ্রব্যের গহণযোগ্য মাত্রাঃ

(১) টেট্রাসাইক্লিনঃ ৫০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(২) অক্সিটেট্রাসাইক্লিনঃ ৩০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৩) সালফামিথোক্সিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৪) সারফাডাইমিথোক্সিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৫) সালফাডায়াজিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৬) সালফাথায়াজিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৭) এমোক্সিসিলিনঃ ২৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৮) অক্সিলিনিক এসিডঃ ৫.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(৯) ডাইফ্লক্সিনঃ১০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(১০) ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিনঃ ৩০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(১১) সালফোনিলামাইডসঃ ৫০.০ মি.গ্রাম/কেজি।
(১২) কোইনোলনসঃ ৫০.০ মি.গ্রাম/কেজি।

নিম্নবর্নিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপস্থিতি সম্পর্কে বছরে অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করে এর প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবেঃ
(১) লেড,
(২) মারকারী,
(৩) ক্যাডমিয়াম,
(৪) কপার,
(৫) আর্সেনিক,
(৬) জিংক।

(গ) বিভিন্ন কীটনাশকের গ্রহণযোগ্য মাত্রাঃ
(১) অরগানোক্লোরিন: ৫০.০ মা.গ্রাম/কেজি।
(২) পিসিবিএস (PCBs): ৫০.০মা.গ্রাম/কেজি।
(৩) এলড্রিন: ০.০২ মা.গ্রাম/কেজি।
(৪) ডিডিটি: ২.০ মা.গ্রাম/কেজি।
(৫) হেপ্টাক্লোর ২.০ মা.গ্রাম/কেজি।
(৬) ডাইএলড্রিন: ২.০ মা.গ্রাম/কেজি।

(ঙ) রোগ প্রতিরোধে চিংড়ি হ্যাচারিতে ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক সামগ্রী ও ঔষধপত্রের তালিকাঃ

১। ব্লিচিং পাউডার (৬০-৬৫% ক্লোরিন)।
২। সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইড (তরল)।
৩। ফরমালিন (এল.আর)।
৪। ফরমালিন (কমার্শিয়াল)
৫। সোডিয়াম থায়োসালফেট।
৬। সোডিয়াম বাই-কার্বনেট।
৭। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন।
৮। ট্রেফলন।
৯। ইডিটিএ।
১০। এ্যাকোয়াকালচার প্রো-বায়োটিক।
১১। জুথামসাইড/প্রোটোজোয়াসাইড।
১২। মিথিলিন-ব্লু।
১৩। ভিটামিন প্রি-মিক্স/মাল্টিভিটামিন/ভিটামিন-সি।
১৪। এম.আর -২২২ (চেতনা নাশক)।
১৫। কুইনালডিন (চেতনা নাশক)।
১৬। ক্লোভ অয়েল (চেতনা নাশক)।
১৭। খাবার লবণ, ছত্রাক নাশক ও জীবাণু নাশক।
১৮। প্রভিডন আয়োডিন।

মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ ভাদ্র ১৪১৮/ ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১

এস,আর,ও নং ২৮৫-আইন/২০১১। - মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২নং আইন) এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।-এই বিধিমালা মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায় -

(ক)''আইন'' অর্থ মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২ নং আইন);

(খ) ''আদর্শ মাত্রা'' অর্থ এই বিধিমালার ১০ এর তফসিল ৬ এ বর্ণিত মৎস্যের পুষ্টি সাধন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মৎস্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রার উপাদান, যেমনঃ আমিষ, স্নেহ, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ, আর্দ্রতা ভস্ম, আঁশ ইত্যাদি উপাদানের এবং সময় সময় মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রা;

(গ) ''কারিগরি জনবল'' অর্থ মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ ও সংরক্ষণাগারে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী;

(ঘ) ''খাদ্যদ্রব্য'' অর্থ তফসিল-৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) এ বর্ণিত মৎস্যখাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ, উপকরণের মিশ্রণ, ফিড বাইন্ডার (Feed binder), ফিড এডিটিভস (Feed additives) এবং খাদ্য সংরক্ষক (Feed preservatives); এবং সময় সময় মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যদ্রব;

(ঙ) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(চ) ''ফরম'' অর্থ বিধিমালায় সংযোজিত কোন ফরম;

(ছ) ''ফিড প্রিজারভেটিভ'' অর্থ তফসিল-৪ এ বর্ণিত মৎস্যখাদ্যে মিশ্রিত উপাদান যাহা খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমান ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে;

(জ) ''ফিড এডিটিভস'' অর্থ তফসিল-৪-এ বর্ণিত মৎস্যখাদ্যে মিশ্রিত উপাদান যাহা পুষ্টিযুক্ত বা পুষ্টিবিহীন এবং খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়;

(ঝ) ''ফিড বাইন্ডার'' অর্থ তফসিল-৫-এ বর্ণিত খাদ্যে ব্যবহৃত এমন উপাদান যাহা খাদ্য উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংযুক্ত করিয়া রাখে যাহাতে উপকরণসমূহ দ্রুত আলাদা না হইয়া পড়ে;

(ঞ) ''ফি'' অর্থ আইনের ধারা ৮ এর অধীন প্রদেয় বিধি ৫- তে উল্লিখিত ফি; এবং

(ট) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ৫ এ সংজ্ঞায়িত কর্তৃপক্ষ।

৩। লাইসেন্স এর জন্য আবেদনের পদ্ধতি ও ফরম।—

(১) আইনের ধারা ৬ এর অধীন লাইসেন্সের জন্য কোন ব্যীক্ত বিধি ৪ এ উল্লিখিত কাগজপত্র ও তথ্যাদিসহ শর্তাবলী পুরণক্রমে ফরম ১ বা, ক্ষেত্রমতে, ফরম-২ বা ফরম-৩ এর মাধ্যমে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি-(১) এর অধীন আবেদনে উল্লিখিত তথ্য যাচাই বাছা ও বিবেচনার জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কারখানা, সংরক্ষণাগার, প্রতিষ্ঠান বা স্থান পরিদর্শন করিতে বা প্রয়োজনবোধে তৎসংশ্লিষ্ট যে অন্য কোন তথ্য চাহিতে পারিবেন।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র ও উহার সিহত সংযুক্ত তথ্য ও কাগজাদি যাচাই বাছাই করিবার পর সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট কোড বা খাতে বিধি ৫ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি পরিশোধের জন্য আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) আবেদনকারী উপ-বিধি (৩) অনুসারে অবহিত হইবার পর উল্লিখিত বিধি ৫ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি নির্ধারিত খাতে পরিশোধ করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ৬ এর বিধান সাপেক্ষে ফরম ৪ এ আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৫) উপবিধি-(১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বিধি-৪ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পালন করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে তিনি আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী না মঞ্জুর করিয়া ফরম ৫ এ আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

৪। লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্তাবলী।-আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত ৩(তিন)টি ক্যাটাগরিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ক্যাটাগরি -১: মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপনন সংক্রান্ত লাইসেন্সের শর্তাবলীঃ-

(১) হালনাগাদ আয়কর সনদ থাকিতে হইবে;
(২) ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সনদ থাকিতে হইবে
(৩) কারিগরি জনবল থাকিতে হইবে (বিধি ২ (গ);
(৪) তফসিল-১ ও ২ এ বর্ণিত সুবিধাদি বিদ্যমান থাকিতে হইবে ;
(৫) বার্ষিক মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতার তথ্যাবলি থাকিতে হইবে;
(৬) মৎস্যখাদ্য উপকরণের মাত্রা ও পুষ্টিমান নির্ধারণের জন্য তফসিল ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) এ বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন করিতে হইবে;

(খ) ক্যাটাগরি -২: মৎস্যখাদ্য উপকরণ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত লাইসেন্সের শর্তাবলীঃ

(১) আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স থাকিতে হইবে;
(২) ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন সনদ থাকিতে হইবে;
(৩) হালনাগাদ আয়কর সনদ থাকিতে হইবে;
(৪) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকিতে হইবে;
(৫) তফসিল ২ এ বর্ণিত সুবিধাদি বিদ্যমান থাকিতে হইবে;
(৬) মৎস্যখাদ্য গুদামজাতকরণ উপযোগী, মানসম্মত ও প্রয়োজনীয় ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্থাপনা থাকিতে হইবে;
(৭) বি. এস. টি. আই (BSTI) হইতে পণ্যের মান সম্পর্কে প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে; এবং
(৮) আমদানির ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে।

(গ) ক্যাটাগরি -৩: মৎস্যখাদ্য বিক্রয় সংক্রান্ত লাইসেন্সের শর্তাবলীঃ

(১) বিক্রয়স্থলের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা থাকিতে হইবে;
(২) বাজার, হাট বা বন্দর নির্দিষ্ট দোকানঘর বা স্থাপনা থাকিতে হইবে এবং দূষণমুক্তভাবে মৎস্যখাদ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে;
(৩) হাল-নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকিতে হইবে; এবং

(৪) মৎস্যখাদ্য মানসম্মত সংরক্ষণের উপযোগী স্থাপনা থাকিতে হইবে।

৫। লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও আপিল ফি।- এই বিধিমালার অন্যান্য বিধিনাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত হারে লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও আপিল ফি প্রদান করিতে হইবে।

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরি	লাইসেন্স ফি (টাকা)	নবায়ন ফি (টাকা)	আপিল ফি (টাকা)
১।	মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (ক্যাটাগরি-১)	১০,০০০	৫,০০০	৬,০০০
২।	মৎস্যখাদ্য আমদানি ও রপ্তানি, সংরক্ষণ (ক্যাটাগরি-২)	১০,০০০	৫,০০০	৬,০০০
৩।	মৎস্যখাদ্য বিক্রয় পাইকারী (ক্যাটাগরি-৩ ক)	১,০০০	৫০০	১০০০
৪।	মৎস্যখাদ্য বিক্রয় খুচরা (ক্যাটাগরি-৩খ)	৫০০	৩০০	৫০০

৬। মৎস্য খাদ্যে ব্যবহৃত এডিটিভস, ফিড বাইন্ডার এবং উপকরণের আদর্শমাত্রা।- (১) গুণগত মা বজায় রাখিবার লক্ষ্যে মৎস্যখাদ্য আইনের ধারা ১০ এর অধীন তফসিল ৪ এ উল্লিখিত এডিটিভস, তফসিল ৫ এ উল্লিখিত ফিড বাইন্ডার এবং তফসিল ৬ এ নির্ধারিত আদর্শমাত্রা থাকিতে হইবে এবং উক্ত আদর্শমাত্রা অনুসরণপূর্বক মৎস্যখাদ্য প্রস্তুত করিত হইবে।

৭। ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য।- আইনের ধারা ১৪ এর বিধান মোতাবেক মৎস্যখাদ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির তালিকা তফসিল ৭ ও ৭(ক) এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

৮। মৎস্য খাদ্যে উপকরণসমূহের আদর্শমাত্রা/পুষ্টিমান নির্ণয় পদ্ধতি।- (১) মৎস্যখাদ্যের উপকরণের আদর্শমাত্রা নির্ণয়ে বিধি ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট নমুণা সংগ্রহকরতঃ নির্দিষ্ট মান নিয়ংত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

(২) বাণিজ্যিক মৎস্যখাদ্যের গুণগতমান ও পুষ্টিমান নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি দ্বারা নির্ণয় করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) আমিষঃ জেলডাল পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি;

(খ) তৈলঃ সলভেন্ট এক্সট্রাকসন (এসিটন/ইথার এক্সট্রাকসন) পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি;

(গ) জলীয়ঃ ১০৫°-১১০° সেলিসিয়াস তাপমাত্রায় ওভেন ড্রাইং পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি;

(ঘ) ভষ্ম বা ছাইঃ ৬০০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৬(ছয়) ঘন্টা ফার্নেস বার্ণিং পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি;

(ঙ) আশঁ: সলভেন্ট এক্সট্রাকসন এবং এসিড ও অ্যালকালি পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কোন পদ্ধতি; এবং

(চ) শর্করাঃ আমিষ, তৈল, আর্দ্রতা, ছাই এবং আঁশের শতকরা হারে নির্ণয়কৃত মান বাদ দেওয়ার পর বাকী অংশ শর্করা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

৯। মৎস্যখাদ্যের উপরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি।- দেশে উৎপাদিত বা আমদানীকৃত কোন মৎস্যখাদ্য বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করিবার যে কোন পর্যায়ে উহার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) মৎস্যখাদ্য উৎপাদক, প্রস্তুতকারক, আমদানীকারক, বিক্রেতা, মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কারখানা, গুদাম, পরিবাহন বা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বা পরিচালক বা সচিব বা ম্যানেজার বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যৌথভাবে সংগৃহীত নমুনা প্যাকেটবদ্ধ ও সিলগালা করিয়া প্যাকেট স্বাক্ষর করিবেন, তবে কেহ স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে সেই ক্ষেত্রে দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে সংগৃহী নমুনা প্যাকেটবদ্ধ ও সিলগালা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংগৃহীত নমুনা ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে নির্দিষ্ট মান নিয়ংত্রণ ল্যঅবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবেন;

(গ) নমুনা প্রাপ্তির অনূর্ধ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি মৎস্যখাদ্যের পরীক্ষার প্রতিবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) কোন মাননিয়ংত্রণ ল্যাবরেটরি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরীক্ষার প্রতিবেদন বা ফলাফল দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুমোদিত অন্য ল্যাবরেটরিতে নমুনা প্রেরণ করিবে। কোন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি মৎস্যখাদ্যের গুনগতমান পরীক্ষায় অপারগতা প্রকাশ করিলে উক্ত ল্যাবরেটরী কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক সংগৃহীত নমুনা অবিকৃত অবস্থায় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন;

(ঙ) কোন মৎস্যখাদ্যে প্রস্তুতকারক পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতঃ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংগৃহীত নমুনা অন্য কোন অনুমোদিত মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মর্তা উক্ত খাদ্যের সংগৃহীত অন্য একটি নমুনা পুনঃপরীক্ষার জন্য অন্য কোন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করিতে পারিবেন;

(চ) কোন মৎস্যখাদ্য দুইটি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবটেরিতে পরীক্ষার পর ভিন্ন রূপ প্রতিবেদন বা ফলাফল পাওয়া গেলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত মৎস্যখাদ্যের নমুনা ৩য় কোন অনুমোদিত মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাইতে পারিবে;

(ছ) কোন মৎস্যখাদ্য ৩টি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা ইহলে সেই ক্ষেত্রে দুটি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির পরীক্ষার ফলাফল অনুরূপ বা কাছাকাছি হইবে তাহার ভিত্তিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত মৎস্যখাদ্যের পুষ্টিমান বিবেচনা করিবেন; এবং

(জ) দফা (খ) এর ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এবং দফা (ঙ) এবং (চ) এর ক্ষেত্রে মৎস্যখাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বা প্রতিনিধি ল্যাবরেটরি পরীক্ষার খরচ বহন করিবেন।

১০। বাজেয়াপ্তকরণ।- কোন মৎস্যখাদ্য ক্ষতিকর বা ভেজাল প্রমাণিত হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ১৬ অধীন উক্ত মৎস্যখাদ্য এবং মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত পণ্য ও যন্ত্রপাতি সমুদয় বা কোন অংশ ফরম ৬ অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।